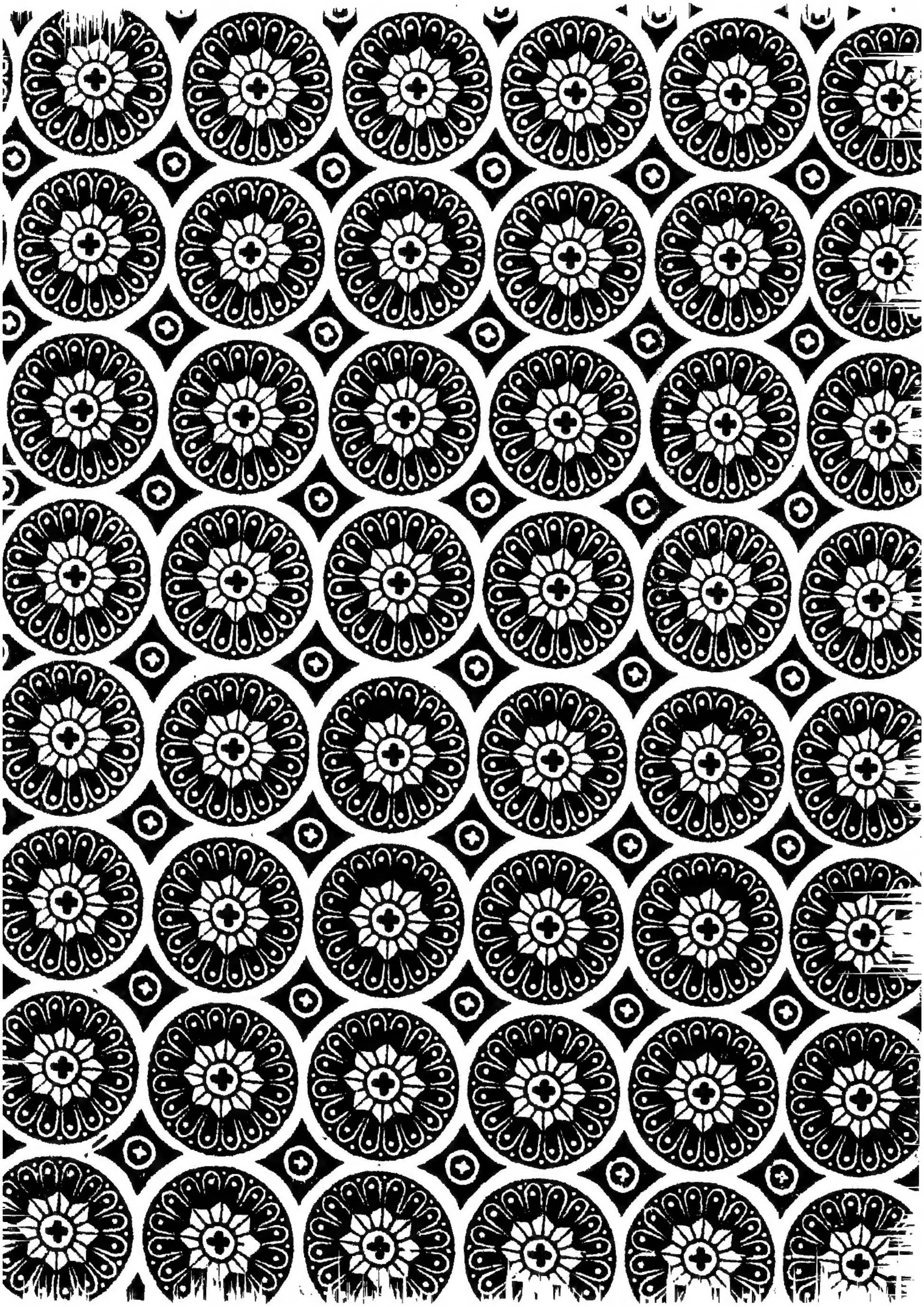

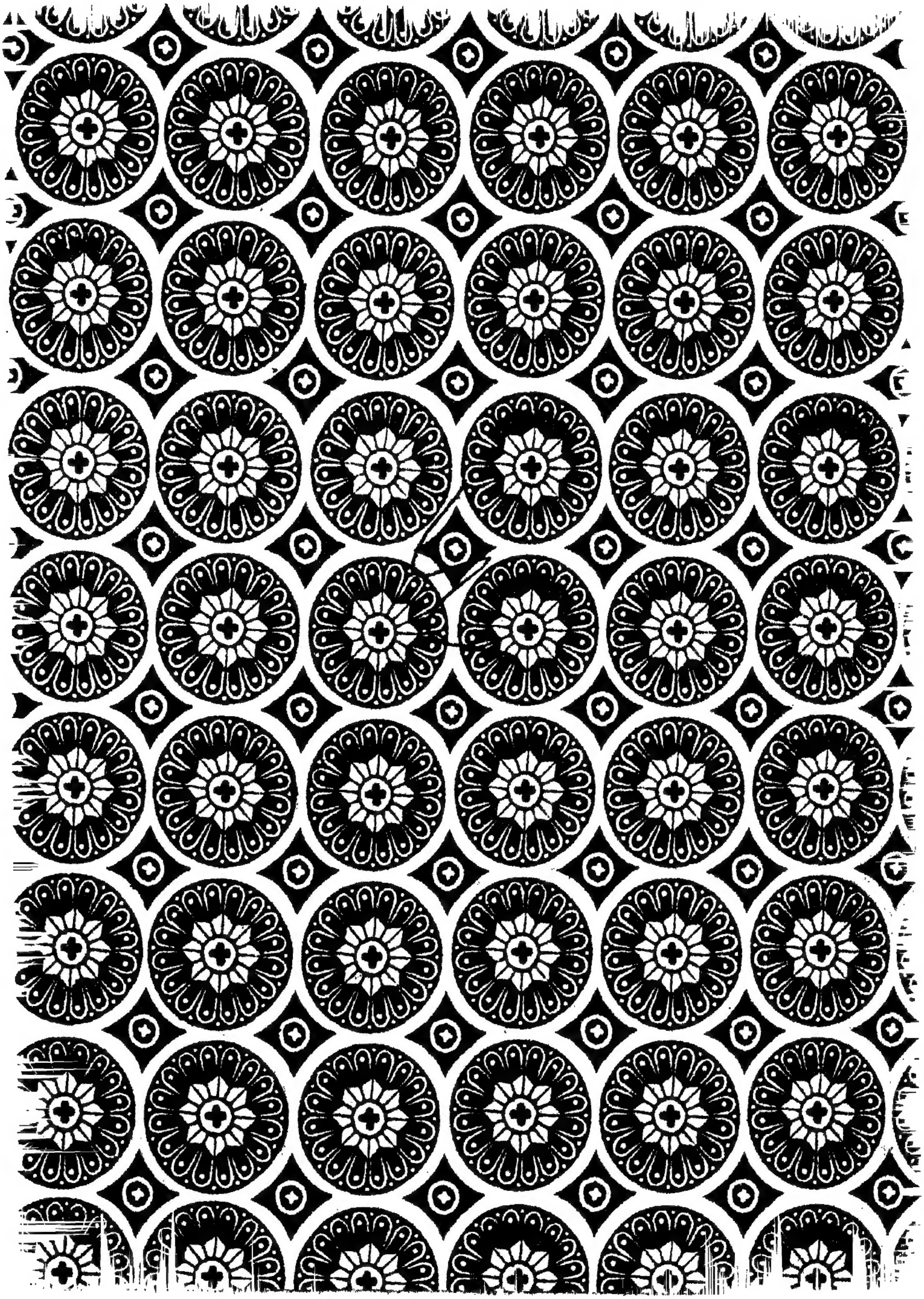

নং ১৫৬২

নরওয়ে ভ্রমণ

শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা প্রণীত

Publisher:
SISIR K. DUTT.
25, SUKEAS STREET, CALCUTTA.

মূল্য ১৲ টাকা

নরওয়ে ভ্রমণ।

কএক বৎসর অতীত হইল আমি কোন বিশেষ কর্ত্তব্যের অনুরোধে গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম। তখন লণ্ডনে অনেকের মুখেই শুনিতাম যে, "এত দূর আসিয়া নরওয়ের মত রম্য স্থানটী না দেখিয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়া বড়ই আপশোষের বিষয়," কিন্তু সে সময় বন্ধুজনের এ সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া শীতের পূর্ব্বেই দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

ইহার বৎসর দুই পরে আবার ইংলণ্ডে যাইতে মানস করিলাম। এবার কিন্তু নরওয়ে দেখাই আমার এত দূর দেশে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেকে বলিতে পারেন যে, স্বদেশে এত দেখিবার স্থান থাকিতে বিদেশ, বিশেষতঃ সাত সমুদ্র তের নদী পারে যাওয়ার আবশ্যকতা কি? কথাটা খুবই সত্য এবং স্বদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার আগে আমাদের মনে এই বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছাটা যে বড়ই অস্বাভাবিক এবং লজ্জাকর তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে কথাটা তলাইয়া দেখিলে অনেকেই হয় ত বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের দেশে আজও স্ত্রীলোকের পক্ষে, সকল জায়গায় যাতায়াত তত সহজ ও সুবিধাজনক হয় নাই। অনেক স্থলে ত এক রকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকের কোথাও যাওয়া ঘটে না। কিন্তু য়ুরোপের প্রায় সকল স্থানেই সকল রকম যাত্রীদের সুখ ও সুবিধার জন্য বেশ সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। এমন কি একজন প্রাপ্তবয়স্কা রমণীও নির্ভয়ে একাকিনী দূরদেশে যাতায়াত করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ অবমানিত বা লাঞ্ছিত হওয়ার কোনই আশঙ্কা নাই। এই সব কারণেই নানা দিক চিন্তা করিয়া স্বদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। মনে মনে কিন্তু ভাবিতাম যে, একটা সখের খাতিরে এত অর্থ ব্যয় করা সঙ্গত কি না!

তারপর আর এক ভাবনা হইল যে, আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা মোটেই পাশ্চাত্য দেশ-ভ্রমণের উপযোগী নয়, এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য জানিবার জন্য মনকে তাগিদ করাতে, সে এ সকল তুচ্ছ বিষয় গ্রাহ্য করিবে না এবং সম্ভবতঃ সকল অসুবিধা ভোগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না বলিয়া কথা দিল। দৈব দুর্বিপাক ব্যতীত আপনার স্ফূর্ত্তি রক্ষায় কখনও বীতস্পৃহা দেখাইবে না এরূপ স্থিরসংকল্প জানাইল। তখন আমি আশ্বস্ত হইয়া যাত্রার দিন ধার্য্য করিলাম, এবং "City of London" নামক জাহাজে টিকিট্ কিনিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইলাম। ক্রমে যখন শুনিলাম যে আমাদের ক এক জন আত্মীয় ও বন্ধু এই জাহাজে যাত্রী হইয়াছেন, তখন এই সুদূর পথের দীর্ঘ দিনগুলি কথাবার্ত্তায় কাটিবে ভাল, বুঝিলাম।

তারপর, নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। তখন আমাদের ভক্তিভাজন এবং স্নেহাস্পদ প্রিয়জন যাঁহারা আমাদিগকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সকলের শুভ ইচ্ছা এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া যে পাথেয় সঞ্চয় করিলাম, তাহা রাজারাজড়ার ঐশ্বর্য্যকেও তুচ্ছ করিবার স্পর্দ্ধা রাখে দেখিলাম। বস্তুতঃ এই মহা সম্বল সঙ্গে না থাকিলে কেবল আপনার থলের টাকা বৃষ্টি করিয়া এই দূরত্বের সঙ্গে দুশ্চিন্তা, বিয়োগের সঙ্গে বিষাদ সাম্‌লাইবার সাধ্য আমার ছিল কি ?

পথে বিশেষ কোন দুর্যোগ হয় নাই বলিয়া লণ্ডনে পৌঁছিতে আমাদের বিলম্ব হয় নাই। সেখানে তখন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন ; সুতরাং তাঁহার বাড়ীতেই গিয়া রহিলাম। তাঁহার বড় কন্যাও আমাদের সঙ্গে নরওয়ের যাত্রী হইবেন জানিয়া মনে বড় আহ্লাদ হইল। কেন না, জানা শুনা এবং মনের মত সঙ্গী না জুটিলে দেশভ্রমণের সুখ পূরামাত্রায় উপভোগ করা যায় না।

যাত্রীর সংখ্যা অধিক বলিয়া তিনমাস আগে থাকিতেই নরওয়ের টিকিট্ কিনিবার জন্য P. & O. কোম্পানী তাগিদ্ পাঠাইল এবং সেই অনুসারে "Mantua" নামক জাহাজে আমাদের তিন জনের টিকিট্ কিনিয়া রাখা হইল। জুলাই মাসেই সেখানে যাইবার উপযুক্ত সময়। কেন না সেপ্টেম্বর হইতে সেখানে আর বড় চন্দ্রসূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, ক্রমাগত বরফ পড়ে আর অসহ্য শীতে মানুষকে একেবারে জড়সড় করিয়া ফেলে।

১১ই জুলাই আমাদের জাহাজ ছাড়িবার দিন। ঘাটে আসিয়া দেখি, সারি সারি অনেক জাহাজ টেম্‌স্ নদীতে নঙ্গর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া সহসা নিজেদের

জাহাজখানা চিনিয়া লওয়া একটু মুস্কিল হইবে ভাবিলাম। কিন্তু যাত্রীর দল সম্মুখীন হইবামাত্র সেই বৃহদাকার ভাসমান গৃহ অভ্যাগত সকলকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিতে লাগিল। তৎপর একেবারে আপনার বক্ষের মধ্যে সকলকে স্থান দান করিয়া আত্মীয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইল। সভ্য দেশের ভাষাতত্ত্ববিদগণ কেন যে ইহাদিগকে কোমলাঙ্গীগণের দলভুক্ত করিয়া গিয়াছেন সহসা তাহার কোন সুযুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না, এবং অদ্যাবধি ইহা আমার পক্ষে এক দুর্ভেদ্য রহস্য হইয়াই রহিয়া গিয়াছে। অথবা কেবল শারীরিক সামর্থ্য সকল সময় আভ্যন্তরিক বলের পরিচায়ক নহে। ললিত অঙ্গেও অনেক সময় প্রচণ্ড প্রভুশক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

জাহাজের কর্ম্মচারীদের কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা এবং সুবন্দোবস্ত দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোথাও "রা" শব্দটি নাই; যেন কোন অচিন্ত্য শক্তির সাহায্যে সুকৌশলে সকল কাজ সুসম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। আমরা জাহাজে উঠিয়াই আপন আপন ক্ষুদ্র কুটীরের তল্লাসে মনোনিবেশ করিলাম। ছয়শত যাটটি কেবিনের মধ্য হইতে নিজেদের নম্বরের কেবিন বাহির করিয়া লওয়া একটু যেন শ্রমসাধ্য হইয়া পড়িল। নানা পথে বহুবার যাতায়াত করিবার পর আমাদিগের বাসকুটীরের উদ্দেশ পাওয়া গেল এবং তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ মাত্র চিরপরিচিত জিনিষপত্রের সন্ধান পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তখন আমি আর আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বিছানার উপর বসিয়া একটু আরাম উপভোগ করিতে লাগিলাম।

জাহাজ ছাড়িতে প্রায় বেলা বারটা বাজিল। এবং সেই সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনেরও ঘণ্টা পড়িল। আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া ভোজনাগারের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। কিন্তু আমরা দুইটি ক্ষুদ্র প্রাণী এই প্রকাণ্ড জলযানের উদর রূপ ব্যূহ ভেদ করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব এমন আশা করিতে পারিলাম না, কাজেই সহযাত্রীদিগের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম। তখন কিন্তু সহসা কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, শেষে মনে পড়িয়া গেল যে, আহ্বান মাত্রই আহারের জন্য অগ্রসর হওয়া ইংরেজি সভ্যতার বিরুদ্ধ। অগত্যা কি আর করি, ত্বরিত গতিতে কিছু সংযত হইয়া চলিতে লাগিলাম। তখন অনেক রামা বামার দর্শন পাইয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া অবশেষে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। দ্বার দেশেই বিপুল দেহধারী এক শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি শিষ্টাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সস্মিতমুখে আমাদিগের পথপ্রদর্শক হইলেন এবং আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া

সসম্ভ্রমে বিদায় লইলেন। আমরা তখন নিজ নিজ কেদারায় বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখি একেবারে লোকে লোকারণ্য। তাই ত! দেশ দেখিবার সখটা তবে অনেকেরই আছে। এইটি মনে মনে চিন্তা করিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। অন্যদিকে আবার, সহযাত্রিগণ নির্নিমেষ নেত্রে এই তিনটি কৃষ্ণকায় জীবকে নিরীক্ষণ করিয়া কেহ বা হাস্যরসে কেহবা বিস্ময়রসে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। ভারতবর্ষ হেন সুন্দর স্থান হইতে কি আকর্ষণে এই ত্রিমূর্ত্তির এস্থানে আগমন, বুঝিবা ইহাদের সমস্যা ইহাই এখন। যাক্ তারপর আহারান্তে যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আবার আমাদিগের পরিচ্ছদ পরিদর্শনে এবং বিশ্লেষণে, আমাদিগের আকৃতি ও প্রকৃতির বিশেষত্ব নিরূপণে, শ্বেতাঙ্গিনীগণ যেন একেবারে সভ্যতার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমরা তখন নিরুপায় দেখিয়া উপরের ডেকে গিয়া আশ্রয় লইলাম। ক্রমে ক্রমে সেখানেও পিপ্ড়ার ঝাঁকের মত সকলে আসিয়া সারি বাঁধিয়া জমা হইল। তখন কিন্তু আমরা নদী ছাড়াইয়া অতল জলধিবক্ষে ভাসমান এবং সেই কারণেই বিনা দুর্য্যোগেও আমাদের বৃহৎ জলযান কিঞ্চিৎ দোদুল্যমান এবং তৎসঙ্গে আরোহীদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই বিশেষতঃ তনুমধ্যাগণের মস্তক বিঘূর্ণিত, নেত্রদ্বয় নিমীলিত, দেহযষ্টি আনত, করকমল প্রকম্পিত এবং চরণযুগল জড়িত হইয়া পড়িল। তখন তাহাদের বাক্‌রোধ, সর্ব্বাঙ্গে পীড়াবোধ এবং বিধাতার বিধানে বিরোধ উপস্থিত হইল। এইরূপে উপরে অনন্ত আকাশ আর নীচে অতল জল দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আমাদিগের যাত্রার তৃতীয় দিন হইতেই প্রকৃতিদেবীর ভাবগতিক কিছু বিভিন্ন দেখা যাইতে লাগিল। নিয়মিত সময়ে নিয়মিত কাজ করা যেন আর তাঁর হইয়া উঠে না। সন্ধ্যার আবির্ভাবের কাল উপস্থিত, অথচ আকাশ হইতে সূর্য্যদেবকে সরাইবার কোনই উদ্যোগ বা ব্যবস্থা তাঁর নাই। এদিকে দিনমণিও দেবীর আদেশ বিনা এক পাও নড়িতে পারেন না। আর লজ্জাবতী সন্ধ্যার ত কথাই নাই; তিনি অন্ধকারের আবরণ ছাড়া আসিয়া দেখা দিতে একেবারেই নারাজ; সে ত জানা কথা। ক্রমে যখন আট্টা বাজিতে চলিল, অথচ অন্ধকারের নাম গন্ধও নাই, তখন আমরা ভাবিলাম এ তবে বাস্তবিকই "Land of mid-night sun" তার আর ভুল নাই। স্থানবিশেষে লীলাময়ীর বিচিত্র লীলাখেলা দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সূর্য্যদেব যেন পশ্চিমদিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়িলেন, তাঁর দীপ্ত রশ্মি যেন ক্রমে নিস্তেজ

হইতে লাগিল। তবে কি তিনি অস্তাচলে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিতেছেন? তাই বটে! তবে তাঁহার এ উদ্যোগে প্রায় প্রহরেক কাটিয়া গেল। তখন আমাদের দেশে রাত্রি দশটা হইবার কথা।

আজ সন্ধ্যা সুন্দরীর একি বেশ! কৈ সে নীলাম্বরী কৈ? ভালে সে সিন্দুর বিন্দু কৈ? অপাঙ্গের অঞ্জন কৈ? চরণে অলক্তকরাগ কৈ? কিছুই কি নাই? এই কি অভিসারের আয়োজন? অথবা অন্তরের পূর্ব্বরাগের উন্মেষে কে কবে অঙ্গরাগ করিয়াছিল? তাই আজ মুগ্ধা সন্ধ্যা শোভন পীতাম্বরের পবিত্র বিন্যাসে, আর বিম্বাধরের সেই বিমোহন হাসির বিকাশেই বল্লভকে ভুলাইতে চলিয়াছেন। এ প্রসাধনের আড়ম্বর নাই কিন্তু মাধুর্য্য আছে, সৌখীনতা নাই কিন্তু মাদকতা আছে। ক্রমে সে পূর্ব্বরাগের

নরওয়ে সমুদ্রের দৃশ্য।

স্নিগ্ধ শুভ্র শোভা গাঢ় অনুরাগের আরক্ত আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই নির্গমন ও আগমনের অন্তরালে এত সময় কাটে, আগে তা কখনও দেখি নাই। ইহাকেই ইংরেজিতে twilight বলিয়া থাকে।

চিত্ত যখন প্রেমের আবেশে বড় চঞ্চল, অপেক্ষার উৎকণ্ঠা তখন ভারি অসহ্য হইয়া উঠে; তাই প্রিয়-সমাগম বুঝি ভাগ্যে আর ঘটে না ভাবিয়া ভীতা সন্ধ্যা কিছু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল, দেখিয়া অংশুমালীর চিত্তবিভ্রম ঘটিল! তিনি আর আপনাকে লুক্কায়িত রাখিতে পারিলেন না। অসময়ে আসিয়া যেই দেখা দিলেন অমনই মানময়ীও দুর্জ্জয় মানের দায়ে একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন! তখন কবির উক্তি মনে পড়িল;—

"অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ।
অহো দৈবগতিশ্চিত্রা তথাপি ন সমাগমঃ॥"

তাই ত! অনন্তকাল ধরিয়া একি লুকোচুরী চলিয়াছে! বিধির একি বিধান! কেন এ অবিচার, কে বুঝিবে?

তার পরের দিনের ব্যাপার আরও চমৎকার! আমরা যখন সূর্য্য আর সন্ধ্যা লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি, তখন প্রকৃতি দেবী তাঁহার আর এক ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ছিলাম আমরা অপার অতল জলে ভাসমান! এ আবার কোন্ মায়াপুরীতে আসিয়া সহসা উপস্থিত হইলাম। এ যে সাগরও নয় সরিৎও নয়, হ্রদও নয়, দীর্ঘিকাও নয়। নরওয়ের যে Fjordsএর কথা শুনিয়াছিলাম, এ বুঝি তবে তাই। সহযাত্রিগণ প্রায় সকলেই দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ফিয়ড্এর দুই পাশে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী কালের অপরি-মেয়তা প্রমাণের নিমিত্তই যেন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতসমূহের আবার বিশেষত্ব এই যে, ইহারা বৃক্ষলতাদিতে সমাচ্ছন্ন নয়। ইহারা কেবলই পাষাণে গঠিত, অথচ যেন আপনাদিগের বিশালতার গৌরবেই গৌরবান্বিত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া আছে। কোথাও আবার এ পাষাণ-দেহ ভেদ করিয়া তরতরবাহিনী নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছে। হিমাচলের বক্ষঃস্থলে দাঁড়াইয়া এ শোভা অনেকেই দেখিয়াছেন, কিংবা বড় বড় হ্রদে ছোট ছোট জাহাজে চড়িয়া অনেকে এই সকল পর্ব্বতীয় দৃশ্য দুই এক ঘণ্টা কাল উপভোগ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু জলপথে হাজার দেড় হাজার আরোহী লইয়া একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ আর কোন পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এই ফিয়ড্গুলি যত গভীর তত প্রশস্ত নয়। এই জন্য বিচক্ষণ নাবিকের সাহায্য ব্যতীত এ স্থলে চলাচল সম্ভব নয়। এক এক স্থান এত সংকীর্ণ যে, দূর হইতে মনে হয় বুঝিবা আর অগ্রসর হওয়া যাইবে না। প্রতিমুহূর্ত্তেই আশঙ্কা হইতেছিল, কখন্

বা পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া জাহাজখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়! আমাদের জলযান কখনও পাশাপাশি কখনও বা সোজাসুজি আবার কখনও বা সর্পগতিতে গমন করিতেছিল। এইরূপে যতই উত্তরাভিমুখ হইতে লাগিলাম, ততই ক্রমে শৈত্য অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন অল্প উচ্চতায়ও গিরিশৃঙ্গ তুষারাবৃত দেখা যাইতে লাগিল, যেন শুভ্র বস্ত্রখণ্ডসকল কেহ বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সেদিন আহারের সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে অথচ সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। একি তন্ময়তা! এ কোথায় আসিলাম! কোথা হইতেই বা আসিলাম! আর মনে পড়ে না। দুই দিকে চাহিয়া দেখি, চক্ষু আর ফিরাইতে পারি না। ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর শৈলশ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন অচল হইয়াও এই মহীধরগণ মহানুভব পুরুষের মত সরিয়া সরিয়া আমাদিগের যাতায়াতের স্থান করিয়া দিতে লাগিল। বিদেশী অতিথির প্রতি এই বিচেতন বস্তুরও এবংবিধ শিষ্টাচার দেখিয়া যেন বিস্মিত হইয়া গেলাম।

এইভাবে অসংখ্য গিরি অতিক্রম করিয়া কুক্ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট প্রথম গন্তব্য স্থান Moulde এ গিয়া পৌঁছিলাম। তখন বড়ই দুর্যোগ! আকাশে ঘনঘটা আর নীচে ঝড় ঝাপ্‌টা! কিন্তু ব্যবসাদার কোম্পানীর ত আর দেবতার কোপ কটাক্ষ মানিলে চলে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিভ্রমণ করাইয়া বিজ্ঞাপিত কালে আবার সকলকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতেই হইবে, পূর্ব্ব হইতেই এরূপ বিজ্ঞাপন যাত্রীদিগের গোচরার্থ দেওয়া হইয়া থাকে। অন্যথা, যে কেহ ফিরিতে বিলম্ব করিবে, তাহাকেই যূথচ্যুত জন্তুর মত সেই ঘোর অজ্ঞাত দেশে অনিচ্ছায় অধিষ্ঠান করিতে হইবে। সুতরাং এ অবস্থায়, এই দুর্দ্দিনে নূতন স্থানের নব দৃশ্যই দেখিতে যাই, কি নিশ্চিন্ত মনে যথাস্থানেই বসিয়া থাকি, সকলেরই এই এক মহা সমস্যা দাঁড়াইল। কুক্ কোম্পানীর ভেরী অতি কর্কশস্বরে সকলকে কূলে যাইতে আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে বড় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। কেবল কএকজন তরুণী শ্বেতাঙ্গী গৌরাঙ্গী তাঁহাদিগের বয়সোচিত অদম্য উদ্যমের বশবর্ত্তিনী হইয়া আপন আপন মনোমত সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া এক ক্ষুদ্র তরণীর সাহায্যে উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া তীরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বিধি বিবাদী হইলে, বিঘ্ন-বিপত্তি এড়ায় কার সাধ্য? তবে নবীন উৎসাহের চেষ্টারও বিরাম নাই। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদের সকল কলকৌশল ব্যর্থ হইল। তরঙ্গের ক্রমাগত আঘাতে বিক্ষুব্ধ বিতাড়িত হইয়াও সে ক্ষুদ্র তরণী এক পাও অগ্রসর

হইবার বাসনা জানাইল না। এ যেন মুগ্ধা নববধূর চারিত্রাবৃত্তি অবলম্বন করিল দেখিয়া আর হাস্য সংবরণ করা গেল না। অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে নবীনারা ফিরিয়া আসিলেন। এ যাত্রার মত এ স্থান দেখিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের Mantua সেই ফিয়ড্ হইতে বাহিরে আসিয়া আবার সাগরের সঙ্গ লইল।

এবার একটু লম্বা পাড়ি। তিনদিন তীরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। যতই উত্তরে যাইতে লাগিলাম ততই কেবলই দিনের আলো। লণ্ডন ছাড়িয়া অবধি রাত্রির মুখ বড় দেখি নাই। তা ছাড়া সন্ধ্যা আসিয়া যে একটু উঁকিঝুঁকি মারিত, এখন সে পালাও বন্ধ বলিলেই হয়। এ কি দেশ! সকাল নাই, বিকাল নাই, রাত্রি নাই, নক্ষত্র নাই, অন্ধকার নাই, অন্ধকারের আভাসও নাই। আকাশে 'এক ভানু' বিরাজ করিতেছেন। সকলেরই আলোতে যেন কি রকম অরুচি ধরিয়া গেল। শীতের দেশ সূর্য্যের উত্তাপ ভাল লাগিবারই কথা; কিন্তু তা বলিয়া চব্বিশ ঘণ্টা, কারই বা তাপ সয়? ঘড়ীর কাঁটার হিসাবে যখন চতুর্থ দিনের দেখা পাওয়া গেল, তখন আবার এক ফিয়ড্এ আসিয়া পড়িলাম। দুই দিকে পাহাড়ের গায়ে ঘর বাড়ী রাস্তা ঘাট দেখিয়া প্রাণটা জুড়াইল। আবার দূরবীক্ষণ হাতে লইবার ধুম পড়িয়া গেল। আরাম-কেদারা ছাড়িয়া সকলেই আবার চট্‌পট্ আসা যাওয়া করিতে লাগিল। মুখের ম্লান ভাব দূরে গিয়া কৌতূহলের হৃষ্টতায় পরিপূর্ণ হইল। যথানিয়মে সকলে পান আহার করিয়া দিনান্তের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল প্রায় এগারটা, অর্থাৎ আমাদের দেশের তখন রাত্রি দুই প্রহর। আশে পাশে কোথাও আর কৃত্রিম আলো দেখা গেল না। আস্তে আস্তে সকলেই আপন আপন কেবিনের আশ্রয়ে যাইতে বাধ্য হইলেন। নিয়ম-লঙ্ঘনের ভয়ে আমরাও সে পথই অনুসরণ করিলাম। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার ভিন্ন ঘুমাইব কি করিয়া? সময় মত দিবানিদ্রার ত কিছু কসুর হয় নাই? তবে এখন উপায়? ভাবিলাম যদি পুস্তক পড়িতে পড়িতে ঘুমটা আসে। বিনা প্রদীপেই ঘণ্টা খানেক পড়া গেল, তখন আমাদের পরিচারিকা আসিয়া অসময়ে আমাদিগের অধ্যয়নে এ হেন অভিনিবেশ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "মহাশয়ারা পরদাগুলি ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া শুইয়া পড়ুন। আর বসিয়া থাকিবেন না।" আমরাও "তথাস্তু" বলিয়া শয্যাশায়িনী হইলাম এবং নিদ্রাদেবীও সহজেই দয়া করিলেন। হঠাৎ জাগিয়া দেখি ভানুদেবের আর কাণ্ডাকাণ্ড বোধ নাই বা সময় অসময় জ্ঞান নাই। তিনি আমাদের মুখের উপর তীক্ষ্ণ রশ্মিজাল ফেলিয়া দিয়া মহা উৎপাত করিতেছেন। আবার

পরদার আড়ালে থাকিয়া আমাদের এই বিড়ম্বনা দেখিয়া যেন আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। আমরা বিদেশী লোক। হেথাকার লীলাখেলা কি বুঝিব, ঘুম ভাঙ্গিয়া রৌদ্রের মুখ দেখিলেই অনুমান করিয়া লই যে, বেলা অনেক হইয়াছে। আজও ঘুমের ঘোরে কোন্ আলোর দেশে যে আসিয়াছি সেকথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কাজেই চট্পট্ উঠিয়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ডাকিয়া তুলিয়া দুইজনে স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া প্রাতরাশের আশায় প্রস্তুত হইয়া ঘণ্টাধ্বনির অপেক্ষায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। "কৈ কারো ত সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না!" এই ভাবিয়া পরিচারিকাকে ডাকিবার উদ্দেশ্যে দেয়ালের বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বারংবার টিপিতে লাগিলাম। কোন ফল হইল না; তখন একটু বিরক্তি বোধ হইল। তাইত! 'কালা আদমীকে' বুঝি এরা 'কেয়ারই' করে না। আচ্ছা! বক্সিসের বেলা বোঝা পড়া আছে। এইরূপে সেই বেতনভোগী ভৃত্যের উপর অযথা বাক্যব্যয় করিয়া ধাঁ করিয়া ঘড়ী খুলিয়া দেখি, ওমা! কি হবে! তিনটাও যে বাজে নাই! তখন দুজনে একচোট খুব হাসিলাম। তারপর করা কি? পরদা সরাইয়া দেখি আমাদের দেশের এক প্রহর বেলার মত রৌদ্রের তেজ! আর কি শোওয়া পোষায়? শুইলেও যে চোখ বোজা দায়। তখন কঠোর তপস্যার ফলে নিদ্রাদেবী করুণা করিলেন, আমরাও সেদিনকার মত বাঁচিলাম। এবার একেবারে আহারের আহ্বানের সঙ্গে গাত্রোত্থান করা গেল। ভোজনের আয়োজন করিতে করিতে আমাদিগের গত রাত্রের অথবা দিনের সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আশে পাশের সকলকে হাস্যরসে কিঞ্চিৎ অভিভূত করিলাম।

আহারান্তে সকলেই প্রথম সিঁড়ির উপরে দেয়ালে নোটিস্ পড়িবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাহাতে লেখা আছে "জাহাজ সম্প্রতি ট্রণ্ডম নামক স্থানে পৌঁছিবে, এবং যাহারা পারে নামিতে ইচ্ছা করেন, প্রস্তুত হউন।" জাহাজের গতি ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল এবং তাহাতেই অনুমান করা গেল যে আমাদের গন্তব্য স্থান নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বড় জাহাজ হইতে তীরে নামিবার জন্য টেনডার (অর্থাৎ ছোট ছোট ষ্টিম্ লঞ্চ) আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। খেয়া পারের মত যাত্রীরা উহা দ্বারা পার হইত। জাহাজ ভিড়িবামাত্র আমরা তিনজনে প্রথম দলের সঙ্গেই নামিলাম, এবং ৩০।৪০ খানা লেণ্ডো গাড়ী আমাদের অপেক্ষায় আছে দেখিয়া তাহা হইতে নিজেদের নম্বরের গাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ঘোড়াগুলি চড়াই

২

রাস্তায় অনায়াসেই চড়িতে লাগিল। তখন মনে হইতেছিল যে, এ মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া বুঝি কোন দেবলোকে গমন করিতেছি। সেদিন আকাশ মেঘশূন্য। এই বাহিরের জ্যোতিঃ আজ যেন অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানকার সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দে মাতাইয়া তুলিল। আজ আর ক্ষুদ্রতা সেখানে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, হিংসা দ্বেষের আর স্থান নাই। আজ এই ক্ষুদ্র মানবহৃদয়কে যেন এক মহান্ ভাবে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে। আজ সে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া যেন সকল অদৃশ্য বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে, সে আর সীমাতে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে না। তাহার দিব্য কর্ণ আজ চরাচর সকলের আহ্বান জানিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ অদ্রিরাজি হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক আমাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে। আর কলকলবাহিনী নির্ঝরিণী প্রগল্ভা রমণীর মত আমাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছে। আমরা প্রকৃতি-দেবীর ইঙ্গিত মত এক নিভৃত কক্ষে গিয়া তাহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম। চারিদিকে হাসির লহরী কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আর ভাবিতেছি আমরা দীন ভারতবাসী, আমাদের এত আনন্দ করা অভ্যাস নাই! কোন্ তপস্যার ফলে এ রাজ্য দুঃখের বার্ত্তা জানে না? এদেশে মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, অন্ধকার নাই, অমাবস্যাও নাই। এত প্রাণভরা হাসি আর আকাশভরা আলো ত আর কখন দেখি নাই। এখানে প্রকৃতি-সুন্দরীর এই থর থর কম্পন কি শৈত্য নিবন্ধন, না সাত্ত্বিক ভাবের নিদর্শন, সহসা বুঝিতে পারিলাম না। আজ বুঝিলাম

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহার,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমার"।

তাই এই দেশীয় ভাষার অজ্ঞতা হেতু এতদিন যে বড় বিব্রত ছিলাম, আচম্বিতে যেন সে বাঁধ খুলিয়া গেল। আজ ভাষার বিভিন্নতায়ও মনের ভাব ব্যক্ত করা কঠিন হইতেছে না। মানুষ যাহা বোঝে না, আজ উদ্ভিদ্ জঙ্গম তাহা বুঝিয়া আমাদিগকে কত আদর করিতেছে, কত আশীর্ব্বাদ করিতেছে, কত কথা জানাইতেছে! ভাষা যেখানে মূক, অন্তরের ভাব সেখানে মুখর, শরীর যেখানে নিশ্চল স্পন্দহীন, আত্মার সেখানে গতি বড় দ্রুত। এ কাহার লীলা? এ কোন্ দিব্য শক্তির প্রভা?

কিছুক্ষণ পরে আমরা সেই নিভৃত কক্ষের নিকট বিদায় লইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধপথে যাত্রা করিলাম। দূর হইতে দেখি, এক সুবৃহৎ সৌধ-সম্মুখে আমাদিগের শকটগুলি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বুঝিলাম, এ স্থানে আমাদের luncheon, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা

হইয়াছে। কেন না ক্ষুধার উদ্রেক হইলে শ্বেতাঙ্গগণ স্বর্গের শোভা নিরীক্ষণেও অসম্মত ;- অগ্রে উদর-পরিপূরণ পরে নয়নের পরিতৃপ্তি, ইহাই বোধ হয় ইঁহাদের রীতি। আমাদের ধর্ম্মপ্রধান হিন্দুস্থানে কিন্তু যেখানেই প্রাণারাম প্রাকৃতিক দৃশ্য, সেখানেই এক একটি তীর্থক্ষেত্র—দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং এই সকল মনোরম ধ্যানধারণা করিবার উপযোগী স্থানে আসিয়াও কেবলই আহারের আয়োজন আমাদের চক্ষে কেমন অশোভন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কি করা যায়!—পাশ্চাত্য-রীত্যনুযায়ী—ভদ্রতার খাতিরে (!) অগত্যা সেই পান্থশালায় প্রবেশ করিলাম। হোটেলবাসিগণ ইতঃপূর্ব্বে বোধ হয় আর কখন আমাদের দেশের লোক দেখে নাই। আমরা কেদারায় উপবেশন করিলাম; সকলেরই কৌতূহলপূর্ণ আশ্চর্য্যদৃষ্টি আমাদিগের প্রতি নিবদ্ধ হইল ;—সকলেই যেন কি একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল! যে ঘরে আমরা বসিলাম, তাহার চতুর্দ্দিকে গরম জলের পাইপ্ থাকায় অত্যধিক শীতের জড়সড় ভাবটা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। এতক্ষণ পদযুগলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত ছিলাম, এখন তাহারা যথাস্থানে আছে বুঝিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইলাম। শীতপ্রধান দেশবাসীদিগের যেন ধ্রুব

'ট্রণ্টজেম্'—'টুরিষ্ট্ হোটেল্'

ধারণা যে, উষ্ণপ্রধান দেশের অধিবাসীরা আদৌ শৈত্যের প্রকোপ সহ্য করিতে পারে না। আমাদের দেশেও যে হিমাচল আছে, এবং তাহারই উচ্চতম প্রদেশে, বসবাস করিতেও যে আমরা অভ্যস্ত, একথা বারংবার নিঃসংশয়িতভাবে বুঝাইয়া দেওয়া

সত্ত্বেও, অনেকের যেন বিশ্বাস জন্মে নাই—মনে কেমন একটু সন্দেহ থাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে যখন দেখিল যে, শীতে তাহারা যতই সঙ্কুচিত—কাতর—হইয়া পড়িতেছে, আমরা ততই—শীত-নিবারণের উপযোগী যথেষ্ট পরিচ্ছদ না থাকা সত্ত্বেও—সোজা—প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছি, তখন তাহারা, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া, আমাদিগের অচিরে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার আশঙ্কা করিতে লাগিল। বঙ্গরমণীদিগের উপযুক্ত শীত-বস্ত্রের কোনও অভাব আমাদের ছিল না, কিন্তু শিরস্ত্রাণ লইয়াই যত গোলযোগ!—অবগুণ্ঠনই আমাদের চিরাভ্যস্ত দেশাচারসম্মত সর্ব্বদা-সর্ব্বত্র-ব্যবহার্য্য শিরস্ত্রাণ; সুতরাং ইহা গুরুভার হইলে চলে না, তাই সম্ভবমত লঘুভার বস্ত্রই তদুদ্দেশ্যে আমরা ব্যবহার করি। ইহজীবনে সূক্ষ্ম-অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত, দুঃখ-দারিদ্র্য-সন্তপ্ত এই মস্তকে হিমবায়ু সেবন কেন—তুষারপ্রয়োগেও সময়ে সময়ে তৃপ্তিলাভ করি। তবে, শীতকালে—দুর্য্যোগের দিনে—যখন জলো কন্‌কনে বাতাস "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে" থাকে, তখনই কেবল একটু কাতর হইয়া পড়ি। এক্ষেত্রেও আমরা সূক্ষ্ম-অবগুণ্ঠনাচ্ছাদনে মস্তক আবৃত করিয়াই গিয়াছিলাম।—এজন্য অপরজাতীয় সহযাত্রিগণ আমাদের জন্য নিয়ত বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন। যাহা হউক, সহযাত্রীদিগের এত আশঙ্কা-উদ্বেগ সত্ত্বেও আমরা যে একদিনের তরেও অসুস্থ হই নাই, সেটা কেবল আমাদের প্রতি বিধাতার বিশেষ করুণার পরিচায়ক বলিতে হইবে!

আহারকার্য্য সমাধা করিতে আমাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগিল। কারণ, তাহাতে চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় সর্ব্ববিধ উপচারেরই আয়োজন ছিল। আহারের অব্যবহিত পরে এদেশেও পানের ব্যবস্থা আছে বটে—কিন্তু তাহা পান-পাত্র নহে—পান-পাত্রে স্থিত তরল-পদার্থ; তাহা চর্ব্বণীয় নহে—পেয় বলিয়া আমাদের অস্পৃশ্য। পানের পরিবর্ত্তে আমরা যে সুগন্ধি মসলা ব্যবহার করি, তাহা বাহির করিতে দেখিয়া, কোন কোন বিম্বাধরা তাহার রসাস্বাদনলোভে সকৌতূহলে আমাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু আসব-গর্ভ-গন্ধ মুখে কি আর এলাইচ-লবঙ্গাদি রোচে? কাজেই ভদ্রতার খাতিরে তাঁহারা সেগুলিকে সুস্বাদু বলিয়া স্বীকার করিলেও, অন্তরে যে তাঁহারা আমাদের রুচির বিশেষ প্রশংসা করিতেছিলেন,—সেরূপ মনে হইল না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, কি মনে করিয়া তাঁহারা সকলেই একবার বাহিরে গিয়া প্রকৃতির শোভা-নিরীক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কি আশ্চর্য্য!—সকল জাতিরই এ কি বিকট ভ্রান্তি—সার্ব্বজনীন অভ্যাস-দোষ! কোনও সুশোভন দৃশ্য দেখিলেই, তাহাকে নশ্বর মানবহস্ত-

প্রসূত সামান্য চিত্রের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়া উঠে—"আহা! যেন ছবিখানি!" কিন্তু যে সুনিপুণ, নিত্য-নূতন-সৃষ্টিকুশল পুরুষ যাবতীয় অসামান্য নরচিত্রকরকে হাতে ধরিয়া আজীবন কলা-কৌশল শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহার রচিত কারুকলার যথাসম্ভব অনুকরণ-সিদ্ধিতেই যাহাদের কৃতিত্বের চরম-সার্থকতা,—তাহাদের সাধ্য কি যে তাহারা সেই সুমহান্ কারিগরের কারুকার্য্য নিজেদের সামান্য চিত্রফলকে ফলাইবে? আজ তিনি নিশ্চল শৈলসমূহে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সন্তানবৎসল পিতার ন্যায়, এই স্নিগ্ধ-সূর্য্যালোকে তাঁহার স্নেহদৃষ্টি-বর্ষণ করিতে করিতে, প্রকৃতি-দেবীর পরিচর্য্যা গ্রহণ করিতেছেন। তাই আজ চারিদিকে কেবল সেবার আয়োজন। পিতৃচরণ ধৌত করিতে গিয়া ভক্ত-সন্তান জল-ধারায় ধরণীকে যেন প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, তবু তৃপ্তি নাই। সারি সারি কেবলই ফুলের সাজি। এ পূজার আরম্ভও নাই শেষও নাই, নিত্য-নিয়ত অনাদিকাল ব্যাপিয়াই চলিয়াছে। আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় এত নিষ্ঠা বুঝিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, আর ভাবিল, এই সভ্য পাশ্চাত্য দেশেও কি স্রক্‌চন্দনে পৌত্তলিক পূজার প্রথা প্রচলিত আছে! তাইত!—ইচ্ছা ছিল, ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া এই নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্বের কিছু সারসংগ্রহ করিয়া লইব,—কিন্তু তাহা আর পারিলাম কৈ? নিয়মিত সময়ে কাজ করিবার সুখও আছে, দুঃখও অনেক! বিশেষ 'কুক্ কোম্পানী'র হাতে পড়িলে, আমাদের ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীরা যেন হাবুডুবু খাইতে থাকে। একেই ত ইহাদের মতে আমাদের সময়ের জ্ঞান আদৌ নাই; তাহাতে যদি আবার চলা-ফিরাকার্য্যে একটু শিথিলতা দেখাই, তবে ত দেশ-দেখিবার সখে একেবারেই ইস্তফা দিতে হয়! এরা আর কি আমাদের উঠা-নাবার ভার লইবে? অগত্যা, মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া, ম্লানমুখে শকটারোহণে তৎপর হইলাম।—এইবার অবতরণ, অতএব অশ্বিনীনন্দনদেরও ত্বরিত-গতিতে গমন আরম্ভ হইল; কিন্তু প্রস্তর-বহুল পার্ব্বত্যপথে অবতরণ নিতান্ত নির্ব্বিঘ্ন নয়, কাজেই মাঝে মাঝে যেন প্রাণটা হাতে করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। যখন আমরা সবেগে অধোগামী হইতেছিলাম, তখনকার নয়নাভিরাম শোভা দেখিয়া মহাকবি কালিদাসের উক্তি মনে পড়িয়া গেল—

> "শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী,
> পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
> সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
> কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥"

ক্রমে আমরা আমাদের ভাসমান বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। শেষে যখন খেয়াপারের উদ্দেশে তারে আসিয়া দাঁড়াইলাম,—তখন প্রায় প্রদোষ-কাল সমাগত!

'ট্রণ্টজেম্ ফিয়ড্'

আমাদের সেই পুণ্যপুরীতে প্রবেশমাত্র সকলকে কেমন একটু ব্যস্তসমস্ত দেখিলাম; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, প্রাতেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, আজ আহারান্তে মহাসমারোহে নৃত্যগীতাদি চলিবে। তাই বিলাসপ্রিয় প্রমোদাগণের আজ এই সমস্ত-দিনব্যাপী সুদূর পথ-ভ্রমণের ক্লান্তি বোধ করিবার অবসর আর একেবারেই নাই। আপন আপন বেশ-রচনার উদ্যম তাহাদিগকে ক্ষণে উৎকণ্ঠিত ক্ষণে উৎফুল্লিত করিয়া তুলিতেছে;—আশ্বস্ত আছেন শুধু সর্ব্ববাদিসম্মত-সুন্দরী যোষিৎগণ! আজ বেশভূষার প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য যুবতীরা ঈর্ষাদ্বেষ উদ্দৃক্ত—প্রৌঢ়াগণ স্ব স্ব 'বয়শ্চোর'-গণকে বাঁধিয়া রাখিবার উপায়-উদ্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত। কিন্তু এ সব বড়ই চতুর চোর—ইহারা সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া সুন্দরীগণের প্রসাধনার সকল সামগ্রীই বেমালুম গাপ্ করিতে জানে, আবার স্বতঃপ্রণোদনে ধরা দিতে আসিয়াও দণ্ডের হাত হইতে

নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকে—দেখিয়া শুনিয়া প্রবীণারা অন্তর্জ্বালায় অস্থির হইয়া ফিরেন! আমরা কএকজন আজ দর্শকদলভুক্ত, সুতরাং স্থিরচিত্তে এ সকল বিষয় সমালোচনা করা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন কাজ ছিল না। আহারের ডাক পড়িতেই নির্দ্দিষ্টস্থানে বসিয়া বরতনুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এবার শ্বেত, লোহিত, হরিৎ, পীত বর্ণসমূহের সমন্বয় দেখা দিল; মাঝে মাঝে আবার, মসিবিনিন্দিত অসিতবর্ণ কোটের আমদানী হইয়া, যেন শশাঙ্কের কলঙ্ককালিমা বিকশিত হইল। তখন ভাবিলাম, যা হউক! বাহ্যজগতে,—এ আলোর দেশে ত এতদিন এ সকল দৃশ্য দেখা ভাগ্যে ঘটে নাই; তাই বুঝি সেই চতুর চিত্রকর, কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমাদিগের দৃষ্টির শ্রান্তি অপনোদনের জন্য, এরূপ কৌশল করিতেছেন!

আহারান্তে ডেকে আসিয়া দেখি, প্রদীপ্ত দীপালোকে এবং কৃত্রিম পত্রপুষ্পে, উহা এক দিব্য নৃত্যশালায় পরিণত হইয়াছে। একপার্শ্বে জাহাজের বাদ্যকরগণ বাজাইবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইঙ্গিত-মাত্র দলে দলে নর্ত্তক-নর্ত্তকীদিগের আবির্ভাব হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যদেশের সকল প্রকার নৃত্যোৎসবেই যুগলরূপে নর্ত্তনের ব্যবস্থা। আমাদের দেশে, কেন জানি না, কিন্তু এবিধি কোনকালেই প্রচলিত ছিল না। আমাদের দেশের নৃত্যনৈপুণ্যে ললিতলবঙ্গলতাগণের অলক্তচরণ নিঃসৃত শ্রুতিমধুর নূপুরধ্বনি সংমিশ্রিত; আর এদেশের নৃত্য-চর্চ্চায়, যুগপৎ কোমল-পদপল্লব এবং কঠিন চরণ-সংশ্লিষ্ট-পাদুকার কঠোর-নিঃস্বনে কর্ণযুগল কিঞ্চিৎ প্রপীড়িত—তুলনায় সমালোচনায় মোটের উপর এই যা প্রভেদ! যুগযুগান্তর হইতে আমরা যুগলরূপের বৈচিত্র্যকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া দেখিয়া আসিতেছি, তাই এইভাবের যুগলরূপ দেখিলে আমাদের শীলতায় কেমন একটু আঘাত করে! হইতে পারে, ইহা আমাদের উচ্চশিক্ষার অভাবের ফল। ফলে, যে কারণেই হউক, বেশীক্ষণ বসিয়া এই কলাবিদ্যা-সম্ভূত অপার-আনন্দ উপভোগ করিতে অসমর্থ হইয়া, ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থানের ব্যবস্থা করিলাম। সেরাত্রে কতক্ষণ এ আমোদ-প্রমোদ চলিয়াছিল, বলিতে পারি না। শুনিতে পাই, এমন সকল ব্যাপারে নিশিভোর করিয়া দেওয়াই নিয়ম। তারপর, যামিনী-জাগরণ-হেতু শ্রান্ত দেহকে পরদিনান্ত পর্য্যন্ত শয্যায় শায়িত রাখায়ও কোন পরিবাদ নাই।

আজ প্রাতে সাগর ছাড়িয়া যে ফিয়ড়ে আসিয়া পড়িলাম, তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। সঙ্কীর্ণ হওয়া দূরে থাকুক,—স্থানে স্থানে ইহার প্রশস্ততা এত অধিক যে, কোথাও আর কূলের সন্ধান পাওয়া যায় না; মধ্যে মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপসমূহ সংস্থিত। এ স্থানটায় কর্ণধার, নিজ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিতে দিতে, জাহাজখানাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া চলিয়াছেন। তিনি যখন প্রথিতযশঃ, তখন আমাদের মিথ্যা ভয়-ভাবনা ত আর ভাল দেখায় না! তখন বুঝিলাম,

"ফিয়ড্"—পারে।

কি মাহাত্ম্য নির্ভরতার! বুঝিলাম, ভক্তজন কেন দুর্দিনে—"হালে যখন আছেন হরি, তোর কিবা ফাগুন কিবা আষাঢ়" বলিয়া মনকে নির্ভীক নির্ব্বিকার করিয়া রাখিতে সমর্থ হ'ন।

যখন এই ফিয়ডের শেষ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলা দশটা। এইবার নোঙ্গর করা হইল। আজকার বিজ্ঞাপনীতে লেখা আছে যে, 'চারিহাজার ফিট্ উচ্চে এক গ্লেসিয়ারের মধ্যে যাইতে হইবে, যাত্রিগণ যেন যথেষ্ট গরম কাপড় সঙ্গে লয়েন।'

কথাটা হঠাৎ যেন কাহিনীর মত বলিয়া মনে হইল। আছি আমরা কোথায় নীচে পড়িয়া! —এত উঁচুতে উঠিবই বা কি করিয়া?

Tender এ পার হইয়া দেখি যে, শাদা শাদা "পনি" জোতা ছোট ছোট শতাবধি দুই চাকার টম্ টম্ গাড়ী (Dogcart) রহিয়াছে; প্রত্যেক গাড়ীতে দুই জনের বেশী ধরে না। আমরা দুই বঙ্গনারী, আমাদের নম্বরমত একখানি গাড়ী দখল করিয়া বসিলাম। ভ্রাতার ভাগ্যে এক স্থবিরা শ্বেতাঙ্গিনী সহযাত্রী জুটিলেন; দেখিয়া সকলেই খুব আমোদ করিতে লাগিলাম। অশ্বচালক ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিল, কেন না আজকার চড়াই বড় সঙ্কটজনক। যখন সারি বাঁধিয়া এতগুলি গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন মনে হইল, যেন সুধা-সংগ্রহে নিমন্ত্রিত হইয়া, মর্ত্যধামবাসী আমরা সুরলোকে গমন করিতেছি। তবে, সে কামচারী রথও নাই, আর সে সারথিও সঙ্গে নাই; থাকার মধ্যে আছে, 'কুক্ কোম্পানী'র জনৈক শ্বেতকায় মাংসল ম্যানেজার তিনিই এ ক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক! তা' দেখা যাউক্, পাশ্চাত্য প্রণালীমতে দিব্যধামে প্রবেশলাভের কি প্রকার ধারা!

উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রথমে যখন অগ্রসর হইতে লাগিলাম, চতুর্দ্দিক্ হইতে, হুলু-ধ্বনির মত, কুলু কুলু রব কর্ণকুহরে যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ভাবিলাম, এই বুঝি আমাদের যাত্রার মঙ্গলাচরণ! কিন্তু এ কুলবধূগণ যে আগন্তুক দেখিয়াও অবগুণ্ঠনে মুখ লুক্কায়িত করিতেছেন না!—এটা বুঝি দেশাচারের ফল!—অধিকন্তু, কেমন হাসিয়া হাসিয়া অঞ্চল উড়াইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। তবে, এ বিলাস-বিলোল মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের সহযাত্রী পাশ্চাত্যপ্রদেশবাসিগণের "অন্তরে গুমরি মরে বাসনা যত"-ভাবটা কিছুমাত্রও দেখিতে পাইলাম না! তাহার অর্থ আর কিছুই নয়—পাশ্চাত্যদেশবাসীদিগের ভাবে ও স্বভাবে, আর আমাদের ভাবে ও স্বভাবে স্বর্গমর্ত্ত্য-প্রভেদ!—অধিকন্তু, এতদ্দেশীয় পাণ্ডা ও যাত্রিগণ, আমাদের ধারণা-মত স্থান-অস্থান, সময়-অসময়, পাত্র-অপাত্র বুঝিয়া ত চলে না—চলিতে পারেও না সুতরাং, আমাদিগকেই বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে।—আমরা কি তাহাদের মত হাসি-কান্না হাতের মুঠায় রাখিতে জানি? কখন্ কোন্ ভাবের আবেগে আমাদের প্রাণ বিগলিত হইয়া নয়ন-পথে ধারারূপে বাহির হইয়া পড়ে, আমরা কি তাহা রোধ করিতে পারি? না, জানি?—না, আমরা তাহার জন্য দায়ী? কাজেই এই পর্য্যটকের দলে মিশিয়া অবধি পোড়া চক্ষু দুটি লইয়া সর্ব্বদাই যেন ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে হাস্যাস্পদ

হইয়া পড়ি!—উপত্যকা ছাড়িয়া যখন আমাদের দল উর্দ্ধগামী হইতে লাগিল, তখন এতগুলি গাড়ী এক লাইনে চলা অসম্ভব হওয়ায় ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বৃক্ষলতাশূন্য পাষাণময় পথে চলিতে চলিতে, উর্দ্ধপানে চাহিয়া দেখি,—অগ্রগামী অশ্বগণ

"রস্‌ডাল"—পথে

ক্রমেই খর্ব্বকায় হইয়া যেন কুকুরের আকার ধারণ করিয়াছে, আর যেন এক একখানা খেলার গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছে। নীচে হইতে যে সকল তুষারখণ্ড বহুদূরে—ছোট দেখিয়াছিলাম, এখন দুই পাশে উহাদিগকে ধরিতে—ছুঁইতে পাইতেছি, আর তাহাদিগের বিশালতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি! ইহারা এত জমাট্ বাঁধিয়া আছে, যে সহসা যেন মর্ম্মর বলিয়া ভ্রম জন্মে। কোথাও মনে হইল যেন প্রকাণ্ড লবণের খনি কিঞ্চিৎ শিথিলভাবে পড়িয়া আছে। এইরূপে ক্রমে দুইধারে কেবল হিমগিরি, আর বামে-দক্ষিণে জমাট্-জল দেখিতে দেখিতে আরও উর্দ্ধে চলিলাম। এবার, অঙ্গের আবরণের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়িল। তখন মোটা কম্বল (Rug) মুড়ি দিয়া, নানাবিধ পশ্মি কাপড়ে নাক কাণ ঢাকিয়া, এক কিম্ভূতকিমাকার জীব হওয়া গেল। এমন সময়, হঠাৎ আকাশে একটু মেঘ দেখা দিল। সূর্য্যদেব আমাদের এহেন দুর্গতি দেখিয়া,

যেন খেদে সেই মেঘান্তরালে মুখ লুক্কায়িত করিলেন, আবার বুঝি স্নেহ-পরবশ হইয়া পরক্ষণেই সস্মিত-মুখে আমাদিগকে আরও উর্দ্ধে উঠিতে আহ্বান করিলেন।—তখন আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! শরীরের শোণিত-প্রবাহ কোন মতেই আর নাসাগ্র পর্য্যন্ত আসিতে সম্মত নয়,—পদতল পর্য্যন্ত পৌঁছান ত দূরের কথা! করযুগল কত কাকুতিমিনতি করিয়াও রক্তের বেগ উত্তেজিত করিতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় পড়িয়া, গিরিসঙ্কুল পথযাত্রায় গাত্রের আচ্ছাদন যথাস্থানে রাখাও দায় হইল! এখন উপায়?—হস্তের সাহায্য ভিন্ন ত আবরণ-রক্ষার উপায়ান্তর নাই! ভাবিলাম, এই পাংশুলা পাণিকে এখন চর্ম্মাদিতে আবৃত করিয়া—একেবারে ব্রহ্মচর্য্যের বেশে সাজাইয়া—পরহিত-ব্রতে ব্রতী করি; কিন্তু সে, রোমশ-দস্তানার আশ্রয়ে আসিয়া এমনই বিরাগী হইয়া পড়িল যে, একেবারে বাহ্য-জ্ঞান বিরহিত! সে যে কি করিতে কি করিতেছে—কিছুই জানি না। এরূপ বিপাকে পড়িলে মনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাই

'নেরোডালেন্'

স্বাভাবিক; কিন্তু না জানি কেন, আজ মন বড়ই প্রসন্ন,—কিছুতেই তার ভ্রূক্ষেপ নাই! আসল কথা, সে এমন স্থানে আর কখনও আসে নাই; এতদিন তাহার পক্ষে যাহা অনুমান ছিল, এখন তাহা প্রত্যক্ষ বিদ্যমান!—এখন সে তাহার বহু পূর্ব্বাবধি নিম্নাঙ্কিত

ছবির সহিত পূরোবর্ত্তী বাস্তবের তুলনা করিতেই ব্যস্ত ; কিন্তু, হায় ! উভয়ের মধ্যে কোথাও বড় একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছে না। তা নাই-ই হইল, সেজন্য সে দুঃখিত নয় ;—প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান পাইলে, কে আর অনুমানের সাহায্য-প্রত্যাশী হইতে চাহে ? এখানে চারিদিকে সবই কেবল শাদা। কবিগণ কেন শুভ্রতার মধ্যে সততই প্রসন্নতাকে পান, আজ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। আবার প্রসন্নতাই যে পবিত্রতার আধার, সে সত্যেও আর সংশয় রহিল না।—শরীরটাকে টানিয়া উঁচুতে তুলিয়াছি সত্য, কিন্তু হৃদয়কেও কি অনুরূপ উন্নত করিতে পারিয়াছি ? সেও কি সত্যই আশেপাশে এমনই শুভ্রতার মধ্য দিয়া চলিয়াছে ?—বুঝি বা তাই ! নচেৎ সে এত প্রসন্নতা পাইবে কোথায় !

এতক্ষণ সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল ; এখন কে যেন আসিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়া গেল—ভয়ে জিহ্বা একেবারে আড়ষ্টপ্রায়। এ শাসন কেন ?—প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পরে চাহিয়া দেখি, দীর্ঘ জটাধারী যোগনিষ্ঠ যোগিগণ, নিস্পন্দ নিশ্চলভাবে ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এ পুণ্য-স্থানে প্রবেশের পূর্ব্বে সকলেরই বাক্য ও মন সংযত রাখিতে হয়—যেন তাহাদের কোন মতে যোগভঙ্গ না হয়। আমাদের প্রতি যে ঐরূপ আদেশ হইয়াছিল কেন,—এতক্ষণে তাহা বুঝিলাম। এখন যে চলিয়াছি, সে এক মহান্ সত্ত্বার মধ্য দিয়া,—তাহাতে শৈত্য-বোধ নাই, বা শ্রান্তিক্লান্তিও অনুভূত হয় না। চারিদিকে "আনন্দরূপমমৃতম্", আর অন্তরে "তত্ত্বমসি"—এই ঋষি-বচনের সার্থকতা উপলব্ধি করা—এখন এইমাত্র কার্য্য ! অবশেষে, সেই ভুবনমনোমোহিনী যাদুকরীর দিকে তাকাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরি !"—কোনই উত্তর পাইলাম না। এবার আরও দুই একখানা কাল' মেঘ আকাশে দেখা দিল, অমনই ভাস্করও পরম-বন্ধুর মত উহাদের স্কন্ধে ভর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন ; বুঝিবা কৌতূহলী হইয়া জানিতে আসিয়াছেন যে, সুদূর দেশান্তরে—প্রাচ্যদেশে যাঁহার প্রভূত-প্রতাপে জীবলোক সতত ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া পড়ে, আজ তাঁহার এ সৌম্যভাব কেমন দেখিতেছি !—থাক্ সে কথা। সূর্য্যদেবের স্বভাব, সকলকে চঞ্চল করিয়া তোলা ;—নতুবা তাঁর তৃপ্তি নাই—অথচ সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যে নীরব-নিভৃতে, একান্তে যোগসাধনা চলিয়াছে—কা'র সাধ্য আছে যে, সে সাধনায় বিঘ্ন ঘটায় ?—তাই, অচল-অটল জানিয়া, অনাদিকাল হইতেই তিনি শৈলশৃঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং তৎসংক্রান্ত যাহাকিছু, সকলেই তাঁর বিতৃষ্ণা ! তা' না হইবেই

বা কেন ? দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী লোককে বাধ্য হইয়া বিনীতভাব ধারণ করিতে হইলেই, আর তার প্রতিপত্তি খাটে না ;– কাজেই সেস্থানে বসবাসও তাঁ'র পোষায় না ! – তার উপর আবার যোগবল ত আছেই !

'ষ্ট্যাল্‌হ্যাম্‌স্কে ভেন্‌'

আজিকার তাঁর এই তেজশূন্য নিরীহভাব দেখিয়া বস্তুতঃই সেই সূর্য্যের সূর্য্য— পরম-সূর্য্যের মহতী-শক্তির কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এমন সময় আচম্বিতে চাহিয়া দেখি, গায়ের কম্বলখানায় সত্য সত্যই তুলাসম তুষার বৃষ্টি হইতেছে। তাইত !—এ দেশের কি এই নিয়ম, যে সকল তরলতাই নষ্ট করিয়া দিবে ?—অন্তরে বাহিরে কোথাও ধারা বহিতে দিবে না ?—সব জমাট্। এবার বুঝি শোণিত প্রবাহও, এদের দেখাদেখি "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" বলিয়া, জমিয়া বসে ;—কিন্তু সে পায়ে পড়িতে একান্তই নারাজ। কোনরূপে এখন গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারিলে হয় ! কিন্তু সে গম্যস্থান আর কতদূর ? এর চেয়েও সুন্দর কিছু আছে না কি ? যখন পথ-চলিতেই এত আনন্দ, তখন যাহার উদ্দেশে এ পথ চলা, না-জানি তাহা কতই সুন্দর !—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—"কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর !"—তিনি যে সৌন্দর্য্যের খনি !—তাঁর ভাণ্ডার কি

সহজে ফুরায় ? মনে আবার উদ্যম উৎসাহ আসিয়া জুটিল। সহসা সমতলভূমি পাইয়া অশ্বগণ শুভ্রতার মধ্য দিয়া সানন্দে ছুট্‌ছিল। হঠাৎ যেমন মোড় ফিরিয়াছে, অমনি যেন চমক্ ভাঙ্গিল—আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম!—এ যে সত্য সত্যই দিব্যধাম মনে হইল—আমি কি জাগিয়া না ঘুমঘোরে আছি ?—চারিদিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, এমন সৌন্দর্য্য ত জীবনে আর দেখি নাই!—কবি গাহিয়াছেন—

"যার খুসি রুদ্ধ চোখে কর বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিম্বা ফাঁকি লভ এই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে,
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে॥"

আজ মহাকবির নির্দ্দিষ্ট পথই অনুসরণ করিলাম। ভাবিলাম, ধ্যান-ধারণায় কি এমূর্ত্তি এমন প্রকটিত হয়! ইচ্ছা হইতেছিল, যত প্রিয়জনকে আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখাই।—সৌন্দর্য্য একা উপভোগ করায় সার্থকতা নাই—এমন দৃশ্য একা দেখিয়া তৃপ্তি নাই। দূরত্ব-জ্ঞান তখন তিরোহিত—ব্যবধান তখন বিলুপ্ত;—স্মরণমাত্রই যেন সকলকে কাছে পাইলাম। কল্পনাবলে প্রিয়জন সনে যখন একই দিব্য-সৌন্দর্য্য উপভোগে বিভোর হইয়া আছি, এমন সময় গাড়ীগুলি এক বিচিত্র ভবনদ্বারে থামিয়া গেল! গাড়োয়ান আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়া আমাদিগের অবতরণের সহায়তা করিতে আসিল! সভ্যদেশের—কি ধনী কি দরিদ্র, কি শিক্ষিত কি মূর্খ, সকলেই শিশুকাল হইতেই নারীজাতির সম্মান করিতে শিখে; কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই! আমরা কিন্তু প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম—সেটা অবশ্য পাশ্চাত্যদেশীয় রীতিনীতি না-জানা বশতঃ নয়—পথে আসিতে আসিতে যে হস্তে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া, নানা অস্পৃশ্য দ্রব্য ধারণ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সহসা সেই হস্ত স্পর্শ করিতে মনে যেন কেমন একটু কুণ্ঠা বোধ হইল।—আর এমনটা হওয়া যে অস্বাভাবিক, তাহাও মনে হয় না।

তারপর যখন দেখিলাম যে, পায়ের আর স্বেচ্ছায় উঠিবার কোন উদ্যোগই নাই, তখন অগত্যা শুধু সে দিনের নয়,—অনেকদিনের আহার্য্যের চিহ্ন পরিলিপ্ত গাড়োয়ানের সেই রুক্ষ করের আশ্রয়ে, অবতরণ-কার্য্য সমাধা করা গেল। পরে সেই হস্তাধিকারীকে, শিষ্টাচারের অনুরোধে, ধন্যবাদ দিয়া সঙ্গিগণসহ সম্মুখস্থিত ভবনে প্রবেশ করিলাম।

সে গৃহাভ্যন্তরে সর্ব্বাঙ্গকে সময়োচিত উত্তাপ দান করিবার সবিশেষ আয়োজন রহিয়াছে দেখিয়া, মনঃপ্রাণ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু আজ ত অন্তরালে বসিয়া থাকিবার দিন নয়। দুই চক্ষুর দৃষ্টি যে কোন মতেই প্রাচীর-সীমায় আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে না; আজ আর মানুষের কারুকলা ভাল লাগিতেছে না।—অন্তর আজ বহির্মুখ। তাই পদদ্বয়, কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র, প্রকৃতি-দেবীর ইঙ্গিতে যেন অমিত-চঞ্চল হইয়া উঠিল!—মুক্ত-বাতায়নে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিল না! কেবল চলি-চলি-ভাব। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর স্বরে কিশোরীর পাদপদ্মের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, আমার পদযুগলও যেন সেই দশাপ্রাপ্ত! তাই বলিয়া কেহ মনে না করেন যে, আমি নিজ হেয় পদদ্বয়কে পদ্মের সহিত উপমিত করিতেছি!—সে নিন্দনীয় বৃথা-স্পর্দ্ধা রাখি না! ঘরের বাহির হইতেই হইবে। তখনও জানিনা যে ঘরের বাহিরে কি আছে। এদিকে আহার্য্য প্রস্তুত, এবং অপরাহ্ন ভোজনের সময়ও উপস্থিত। যাই বা কেমন করিয়া? সঙ্গীরা কেহই ত উদর-পরিতৃপ্তি না করিয়া, কিছুতেই এক পাও নড়িবে না! অথচ আমার ত আর দেরী সয় না! কি করি! যা থাকে কপালে বলিয়া, প্রকৃতি-রাণীর সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।—বেশীদূর যাইতে হইল না। সেই পান্থশালার পাশেই আমার ঈপ্সিত সকল জিনিস একসঙ্গে পাইলাম। কিন্তু সে পাওয়ার হিসাব দিই, এমন ক্ষমতা আমার ছিল না। এ কি পাওয়া! এ পাওয়া চক্ষুকে তৃপ্ত করিল, মনকে মুগ্ধ করিল, চেতনা বাড়াইয়া ভূমানন্দের আস্বাদ জানাইল। এদেশে আসিয়া অবধি কত আধারে, কত আকারে যে অনন্ত লীলাময়ের কত লীলাই দেখিলাম, তার সংখ্যা নাই; কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম,—ইহা যেন লীলাময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা-বিগ্রহ।

এই পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত প্রদেশে ত যথায় তথায়ই হ্রদ পড়িয়া আছে, সুতরাং শুধু সুবৃহৎ একটি হ্রদ রহিয়াছে, একথা বলিলে এ স্থানটির কোন বিশেষত্বেরই পরিচয় দেওয়া হয় না; অথচ কেবল পাঠকপাঠিকার কল্পনার হাতে ইহাকে ছাড়িয়া দিতেও মন চায় না!—যদিও কল্পনার ধারণায় আসে না, এমন পদার্থ বড় একটা নাই; কিন্তু এমন মোহন-মধুর-বিচিত্র-সৌন্দর্য্য-সমাবেশ বুঝি কল্পনারও অতীত! হ্রদে জল থাকে, এবং স্থানমাহাত্ম্যে তাহা জমাটও হয় জানি, কিন্তু এমন ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র বর্ণ, এমন গুণের পার্থক্য, আর এত অধিক রসের প্রকর্ষ, সর্ব্বত্র থাকে কি? তাই বলিতেছিলাম, কল্পনায় ঠিক ইহাকে আয়ত্ত করা যায় না!—কোন কালে এ জলাশয়ে কেবলই স্বচ্ছ

সলিল ছিল, অথবা ইহা নিরবচ্ছিন্ন নীহারে আবৃত থাকিত কি না—আজ দেখিয়া তাহা নিরাকরণ করা সুকঠিন! এককালে যে চতুষ্পার্শ্বস্থ হিমাদ্রি-শ্রেণীর হিমানীনিচয় বিগলিতধারায় প্রবাহিত হইয়া ইহারই উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল,—এই হ্রদ যে তাহারই পরিণতি—আজও তাহার বহু নিদর্শন বর্ত্তমান। কিন্তু তাহারা এখানে আসিয়াও শৈত্যের প্রতাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে না পারিয়া, যেন যেখানে-সেখানে পড়িয়া আতঙ্কে নিস্পন্দ—হৃতচৈতন্য হইয়া পাষাণবৎ পড়িয়া আছে। আবার কোথাও, যেন আপনাদের অন্তর্জ্বালা নিরুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া, এই পাষাণ ভেদ করিবার উপক্রম করিতেছে। কোথাও আবার ফাটে-ফাটে-ফাটেনা গোছ হইয়া রহিয়াছে। তীক্ষ্ণরশ্মির করজালকে এরাজ্যে সততই সংযত রাখিতে হয় বলিয়া, তিনিও এতদঞ্চলে নিষ্ক্রিয়—স্তব্ধ! নচেৎ এমন স্নিগ্ধ কোমল তুষারকে চির-পাষাণে রূপান্তরিত করিয়া রাখিবার সাধ্য ছিল কার?

এদিক্ ছাড়িয়া যখন সেই হ্রদের অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম, নীল-নিভ কি দেখা যাইতেছে। উর্দ্ধে দিগ্বলয় পর্য্যন্ত—আকাশের নীলিমা ব্যতীত, এ বর্ণ ত এরাজ্যে অন্যত্র নয়নগোচর হইবার কথা নয়।—তুষারে আকাশ প্রতিবিম্বিত হইলে ত ওরূপ দৃষ্ট হইত না! ও যে স্বচ্ছসলিল-ক্ষেত্র! কোন্ উত্তাপ তবে এ পাষাণ বিগলিত করিয়া জীবনে পরিণত করিল! নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ভূধরগর্ভস্থিত কোন গুপ্ত-রহস্য নিহিত আছে! এই আধ-ধবল, আধ-শ্যামল শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ত আর আশ মিটে না।—এ কি মাধুর্য্য!—কাহার মধুরিমার এ প্রত্যক্ষ প্রকাশ—এ জাজ্বল্যমান বিকাশ! তখন মনে পড়িল,—আজ যে আমরা এই অমরধামে এই মাধুর্য্যামৃত পান করিয়া ধন্য—কৃতার্থম্মন্য হইবার আশয়েই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি। আহা! কতদিক্ হইতে, কত সৃষ্টপদার্থে, কত কৌশলে এই নিরবচ্ছিন্ন নিরবদ্য—মাধুরীধারা ঢালিয়া দিতেছে! আমি দুইটি মাত্র চক্ষু লইয়া কেমন করিয়া তাহা উপভোগ করিব? একেই পোড়া নয়নযুগলের শক্তি অতি ক্ষীণ, তাহাতে আবার অশ্রু আসিয়া সময়ে অসময়ে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, সে যে যুক্তি মানে না, নিষেধও শোনে না। হায়! আজ চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইলাম। সতৃষ্ণ হইয়া—পেয়সম্মুখীন, সন্নিহিত থাকিয়াও—আঁখি নিজ আকুল পিপাসা মিটাইতে পারিল না। আজ বুঝিলাম, দিব্যধামে আসিয়া, দিব্যচক্ষু-সম্পন্ন না হইলে, সকল দিব্য-বস্তু-দর্শন সম্ভবপর নহে। অমৃতলাভ করিলাম—কিন্তু সেবনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না—শুধু পাওয়ায় ত অমর হওয়া যায় না। আমরা

যখন অমৃতের সন্তান, তখন অমৃতে ত আমাদের অধিকার আছেই, কিন্তু হায়! পানের রীতি জানি না—শিখি নাই যে!

"ন যত্র দুঃখং ন সুখং চিন্তা, ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদ্ ইচ্ছা।"

এমন পান-পাত্র সঙ্গে আনিয়াছি কি? সুতরাং, "ঢেঁকির স্বর্গে গিয়াও ধান-ভানা" ভিন্ন, আর কি হইবে!

এইরূপে বাহিরে যখন নীরব নিস্তব্ধ ভোজের ব্যাপার চলিতেছিল, তখন ঘরের ভিতরে আসিয়া তাহার বিপরীত দেখিলাম। এখানে স্বয়ং অপ্সরাগণ স্বহস্তে সুধা বণ্টন করিতেছেন। ইহারা সপ্তসহোদরা, সুরুয়া হইতে সুরু করিয়া তালিকা মত, নিপুণতাসহকারে পরিবেষণ করিয়া যাইতেছে। ইহাদের পরিধেয়-বস্ত্র অতীব শোভন ও পরিচ্ছন্ন এবং চেহারাও বেশ প্রসন্ন। শুনিলাম, বেশভূষা-বিষয়ে নরওয়েবাসীরা সকলেই য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণ করিয়া থাকে, কেবল পরিচারিকার দল নাকি অদ্যাবধি তাহাদের স্বদেশের পরিচ্ছদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেছে। তাহাদের পরণে একটি সাদা ঘাঘরা, আর গায়ে সাদা জামার উপরে জরীর কাজ করা, লাল মকমলের একটি জোয়াকি। স্কন্ধের দুইপাশে দুইটি বেণী লম্বমান, আর মস্তকোপরি একটি লেসের টুপি বর্ত্তমান। স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ইহাদের গণ্ডস্থল আরক্তিম, আর রংটি যেন দুধে আলতায় মিশান। নেত্রযুগল নীল-পাটল, আর কেশকলাপ কনকোজ্জ্বল, তাহাতে এই সুরুচি-সম্পন্ন বেশ বিরচনা, আমাদের চোখে কেমন একটু চমকা লাগাইয়া দিল। আমরা যেমন এদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছি, এদের চক্ষুও তেমনই আমাদেরই মুখের উপর পড়িয়া আছে। তাহারা পরিবেষণের স্থলে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই আমাদিগের দিকেই আসিতে লাগিল। তখন বুঝিলাম যে, আমরা এ দেশে আসিয়া, যেমন একদিকে দর্শক, তেমনই আর একদিকে দর্শনীয় পদার্থরূপেও পরিণত হইয়াছি।

এবার প্রস্থানের আয়োজন। কে বলিতে পারে, হয় ত জন্মের মত এই "Lake Dyupvand in Merock"এর লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া বিদায় লইলাম। বিদায়-কালে শুনিলাম, এই সপ্তভগিনীর জননীই নাকি, এই পান্থশালার স্বত্বাধিকারিণী। প্রতি বৎসর তিনি এপ্রেল মাসে কন্যাগণ সহ এখানে আগমন করিয়া সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত আপন কার্য্য সাধন করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। তখন আর এখানে থাকা চলে না, বরফে সব ঢাকিয়া যায়।

এখন যার যার গাড়ীতে চড়া। এবারে আবার সেই আদবকায়দা-দুরস্ত, দুইটি প্রশস্ত হস্ত প্রসারিত হইল। এবার হস্তদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে, আর আমাদের পূর্ব্বের মত দ্বিধা-জড়িত ভাব নাই। ভাবিলাম, তাইত! "রূপেতে কি করে বাপু! গুণ যদি থাকে।" হউক না অমসৃণ অপরিচ্ছন্ন,--বিপন্নের বন্ধু ত বটে!

সকলেই বলিয়া থাকেন, ওঠায় আর নামায় স্বর্গ মর্ত্ত তফাৎ; সেটা কেবল কথার কথা নয়, কাজেও তাই। ওঠায় অনেক সময় অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়, নামায় তাহা না হইলেও চলে। নামার মুখে অশ্বগণ, তাহাদিগের চালকদিগকে আরোহীদের পশ্চাতে আপন আপন স্থানে বসিতে অনুমতি দিল, কেন না স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে নামিতে তারা নিজেরাই বেশ পটু। তবু যদি "নাম্‌কা ওয়াস্তে" একটা লাগাম রাখা দরকার হয়, তাতে তাদের আপত্তি নাই; কিন্তু সে লাগাম ঢিলা রাখা চাই। হ'ক্ না হ'ক্ কেইবা এ সংসারে কেবল চালকের চালমত চায়? গাড়ীতে বসিয়া, পরোক্ষ আর সমক্ষের ভেদবিচারে মনটা ব্যস্ত রহিল। ভাবিলাম প্রত্যক্ষের মহিমা আর কতক্ষণ! দেখিতে দেখিতে ত সকলই স্মৃতির ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত হয়। স্মৃতিও আবার কয়দিন পরে কিছু চাপা দেয়, কিছু ছাঁটিয়া ফেলে, এবং যাহা সার মনে করে, তাহা ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখে। কিন্তু এই সার বোঝা লইয়াই যাহা কিছু বোঝাপড়া, যতসব বিবাদ-ঝগড়া। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে চাহিয়া দেখি, চারিদিকে কেমন একটা হুট্ পাট্ লাগিয়া গিয়াছে। অশ্বগুলি কেবলই সর সর, ছাড় ছাড় ডাকহাঁক করিতে করিতে চলিয়াছে। তা পথ সরে ত পাহাড় ছাড়ে না, পাহাড় ছাড়ে ত, শৈলরাজি শোনে না, ভারি মুস্কিল। সত্যি এদের অতিথিসৎকারকে বলিহারি যাই। আমরা তখন ইহাদের শিষ্টাচারে মহা তুষ্ট হইয়া, আমরা যে নিতান্তই কুক্ কোম্পানীর হাতে বাঁধা আছি, সে কথা জানাইলাম; আর বৃথা পথশ্রম স্বীকার না করিতে করযোড়ে অনুরোধ করিলাম। তখন সজ্জনের মত ইহারা অগত্যা বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন দেখিয়া, ভানুরাজ ভারি খুসী। এমন তেজস্বী জনের কি আর, নিস্তেজ নিরীহের মত থাকিতে ভাল লাগে? বাকি রাস্তা তিনি বেশ একজন মুরুব্বির মতই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আমরাও পুরাতন বন্ধুকে পুনরায় পূর্ব্ব হালে পাইয়া পরম প্রীত হইলাম।

বাসস্থানে আসিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সবই চলিল, সবই মিলিল, কেবল কারও কারও মনের সন্ধান পাওয়া গেল না। বুঝি বা সেটা সেই স্বপ্ন-রাজ্যে পড়িয়াই হিমসীম

খাইতেছে। শরীরটা এক রকম চৈতন্যরহিত হইয়া আরাম-কেদারায় পড়িয়া আছে। তা যার যাবার তার গিয়াছে, অন্যের অত মাথাব্যথায় প্রয়োজন কি ?

এখন হইতে নাকি নূতন নূতন স্থান দেখিয়া আর বারদিন পরে লণ্ডনে পৌঁছিব, এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। যত দক্ষিণে ফিরিতেছি, ততই শীত কমিয়া আসিতেছে, আর অন্ধকার দেখা দিতেছে, দস্তুরমত সন্ধ্যাকেও পাওয়া যাইতেছে।

বিজ্ঞাপনের তালিকামত আজকার যাবার জায়গার নাম Trollhattan. সেখানে এক প্রখ্যাত প্রস্রবণ আছে। ঘাটে আসিয়া রেলগাড়ীতে চড়িয়া যাইতে হইবে। যাই আমরা আসিয়া, আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাষ্পীয়-শকটে আরোহণ করিয়াছি, অমনই সে গা ঝাড়া দিয়া ছুট দিল। আমাদের দেশের মত এদের ত ভয়ে ভয়ে চলা নাই।

ট্রলহাটান

ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল যাওয়া চাই। গাইড্ মহাশয় আমাদের সঙ্গী হওয়াই সঙ্গত মনে করিয়া আমাদের গাড়ীতেই আসিয়া বসিলেন। কুবেরের ঐশ্বর্য্যকেও আমরা অতিক্রম করিয়াছি, হয় ত বা তাহার অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশীর মনের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে উভয় পক্ষকেই ভারি ভোগায়। যাঁরা দূরদেশভ্রমণে বাহির না হইয়াছেন, সে দুঃখ তাঁদের বোঝান সম্ভব নয়। সে বেচারা আমাদের অবগতির জন্য হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া কত যে নিবেদন করিতে লাগিল, সে সব স্মরণ রাখিতেও শক্তির প্রয়োজন দেখিলাম। এইরূপ প্রহরেক এক তরফা প্রলাপের পর, আমরা যেন নিস্তার পাইলাম। গাড়ী থামিয়াছে, লোকজন নামিতেছে

এবং হাঁ করিয়া দেখিতেছে, কোথা হইতে বা সেই প্রখ্যাত নির্ঝরিণী নামিয়া আসিতেছে? তখন আমাদের পথপ্রদর্শকের নিকট শুনিলাম যে, সে নাকি এখনও আরও ঘণ্টা আধেকের পথ বাকি। ফের ঘোড়ার গাড়ীতে চড়া। আবার গাড়ীর ঘড়ঘড়ী, এক পান্থপুরীর পুনর্দর্শন, তন্মধ্যে প্রবেশ এবং পরিবেষণের হুড়াহুড়ি, তৎসঙ্গে কাণে শোনা সেই মহা ঝরণার ঝরঝরি, তারপর সকলে উদরজ্বালা সম্বরণ করিয়া, পদদ্বয়েই ভর দিয়া, বেশ একটু তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়া এক সুন্দর সেতুবন্ধের উপরে দাঁড়াইলাম। এই টুকু আসিতে দুই চক্ষে কি দেখিলাম, কিছু জ্ঞান নাই। জানি কেবল একটা নীরব নদী আমাদের সঙ্গে চলিয়াছিল। খানিক পরে হঠাৎ তার ভাবগতিক বদলাইয়া গেল। কি মনে করিয়া সে ক্ষণেকের জন্য তার তীরস্থিত তরুরাজির অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিল—তারপর একেবারে এই উন্মত্ত অবস্থায় আসিয়া দেখা দিল। এ কিসের

টলহাটানের নীরব নদী

উচ্ছ্বাস! কে একে এমন পাগল করিয়া দিল? প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর সে যখন আপন মনে আত্মকাহিনী কহিয়া যাইতে লাগিল, তখন কাণ পাতিয়া শুনিলাম যে, সে অতি উচ্চকুলোদ্ভবা, কোন শৈলেশ্বরের আত্মজা। শৈশবে বড় সুখে পালিতা, নিশিদিন পিতামাতা দুহিতাকে আপন বক্ষে আঁকড়িয়া রাখিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না। বড় ভয়, পাছে কোথাও গেলে হারাইয়া যায়, তাই ঘরের বাহির হইতে

দিতেন না। সর্ব্বদাই বদ্ধাবস্থা। খেলার সাথী সঙ্গী অনেক জুটিয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ এক আঙ্গিনার মধ্যে যা কিছু আমোদ আহ্লাদ করা। ক্রমে যখন সে শৈশব ছাড়িয়া কৈশোরে পদার্পণ করিল, তখন আর তার এসব শিশুখেলা ভাল লাগিল না। যখন তখন তার গণ্ডস্থল বহিয়া দু'চার ফোঁটা চক্ষের জল গড়াইয়া পড়ে, আর ভাবে, এভাবে দিন কেমন করিয়া কাটিবে। পিতা দেখিলেন, সন্তানের অবস্থা শোচনীয়, মায়েরও আর পাষাণে বুক বাঁধিয়া থাকা চলে না, তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া কন্যাও এদিক ওদিক একটু আধটু উঁকিঝুঁকি দেয়। কিন্তু একে রাজার ঝি, তাতে এতকাল এক রকম বন্দী; এই বন্ধুর ভূমিতে বেশী দূর পা চলে কি? একটু চলিতেই থমকিয়া দাঁড়ায়, আর চারিদিকে চায়। আশে পাশের সঙ্গিনীরা

ট্রলহাটানের নদীর উন্মত্ত অবস্থা

আসিয়া তখন হাতে ধরিয়া লইয়া যায়। এই ভাবে সে দিন কাটায়। একদিন কেমন উন্মনা হইয়া, পিতার পায়ে পড়িয়া লুটালুটি, আর মায়ের বক্ষে পড়িয়া কাঁদাকাটি,—"আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি আর ঘরে রইতে নারি। আমায় ডেকেছেন আমার শ্রীহরি।" কিশোরীর কাণে যখন প্রিয়তমের ডাক প্রথম পৌঁছায়, এবং সে ডাকে প্রাণে সদ্য প্রেম জাগায়, তখন সে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে না, ভালমন্দ বোঝে না, যুক্তিতর্ক মানে না। তার মুখে শুধু এক বুলি "ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে।" মা বাপ তখন নিরুপায়, সাধ্যমত তাহারই কথায় সায় না দিলে, হিতে বিপরীত হইয়া যায়, এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া যোগনিষ্ঠ জনকজননী, শান্ত সমাহিত চিত্তে—সন্তানের

শুভ কামনায়, নীরব নিশ্চল থাকিয়া, তাহার যাত্রায় অনুমতি দিলেন। এ যাওয়া যে সে যাওয়া নয়! একেবারে জন্মের মত জন্মস্থান হইতে বিদায়, আর প্রত্যাবর্ত্তন নাই। তবে অন্তরের যোগ? সে ত থাকিবেই। এ যোগাযোগ ভিন্ন এই সরল কোমল প্রাণে এত বল যোগাইবে কে? মায়ের নাড়ী ছাড়িয়া সন্তানের পুষ্টি কোথায়? ক্ষুণ্ণ মনে ক্ষীণ প্রাণ লইয়া সে বালিকা বিদায় হইল। সঙ্গে স্বজনগণ প্রহরী চলিল। ক্রমে যখন সে রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল, তখন পর্ব্বতরাজ দুহিতার পিত্রালয় পরিত্যাগের বার্ত্তা শ্রবণে কৌতুহলী হইয়া, কত কত তরুণী গিরি-তরঙ্গিণী তাহার সঙ্গ লইল দেখিয়া, শৈলস্বগণ সকলেই সসম্ভ্রমে সরিয়া পড়িলেন। কেন না অকারণ, কুল-কামিনীগণের পথ-অনুসরণ, তাঁহারা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ আচরণ বলিয়া জানিতেন। মাতা ধরিত্রীর হাতে ইহার সংরক্ষণের ভার রহিয়াছে জানিয়া, তাঁহারা আর কোন উদ্বেগ অনুভব করিলেন না। এই যে অজানা, অচেনা পথ দিয়া সে চলিয়াছে, কিছুতেই তার ভয় নাই—ভ্রূক্ষেপ নাই। মুখে কেবল—"সর সর—পথ দাও" "আমায় কেহ বাধা দিতে আসিও না, কেহ আমায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না"। এখন আর তার ক্ষীণ দেহ ক্ষুদ্র প্রাণ নাই। প্রেম তাহাকে ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিতেছে, তার শক্তি বাড়াইয়া দিতেছে। তাহার এই উদ্দাম রূপযৌবনে বিমুগ্ধ হইয়া, কোথাও বৃষস্কন্ধ কোন উপলখণ্ড, বুক পাতিয়া তাহার পথ রোধের চেষ্টা করিতেছে, দেখিয়া, গরবিণী অমনই পাশ কাটাইয়া, তাহার আশার বাসায় বালি ছড়াইয়া দিয়া, অট্টহাসি হাসিয়া চলিয়াছে। কোথাও আবার কোন সাহসী সেতুবন্ধে এ যাত্রার বিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জানে না যে, প্রেমময়ী, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সেই প্রেম-মহাজনের আশ্রয়ে আসিয়াছে। কিন্তু এবারে অনুনয় বিনয়, এখানে গরবের কাজ নয়, "নম্র হৃদয়ে নয়নেরি জলে" লতার মত বেড়িয়া বেড়িয়া চরণ চুমিয়া ভিক্ষা চাহিতে হইবে, তবেই পথ পাওয়া যাইবে। "শরণাগত জন ক্ষুদ্র হইলেও উচ্চাশয় ব্যক্তি তাহাকে কখনও বিমুখ করেন না" এই মহাবচন শৈলজার স্মরণে ছিল। এবারে দ্রুতপদ-সঞ্চালন। বাধায় বাধায় সব গতিরই নাকি বেগ বাড়ায়, তারপর আরও আনন্দে মাতায়। এবারে উচ্ছ্বসিত প্রাণ কূল ছাপাইয়া উঠিতেছে, তখন তীরভূমিও আহ্লাদে আটখানা হইয়া ইহারই গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। আবার আগুয়ান। পথে পতি-দর্শনে পরাঙ্মুখী কএকটি দুর্ব্বলা গিরিবালা, তাহাদের বিরহকাতর শীর্ণদেহকে ভূগর্ভে বিলীন করিতে যাইতেছে দেখিয়া, উদারচেতা এই রাজসুতা, উহাদিগের প্রিয় সম্মিলন ঘটাইবেন

বলিয়া—প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং সস্নেহে ডাকিয়া লইয়া, আপন বক্ষোমাঝে স্থান দিলেন। কারণ আপন প্রিয়তমকে বহুবল্লভ দেখিতে, যথার্থ পতিপরায়ণার প্রাণে দ্বেষহিংসার লেশ থাকে না, মান-অভিমান স্থান পায় না, বা তার একনিষ্ঠতে প্রতিষেধ জন্মায় না। বরং সপত্নীজন দ্বারাও যে পতি-সেবার সার্থকতা অনুভব করা সম্ভব হয়, তাহা আপন জীবনে প্রতিফলিত দেখাইতে চান। বুঝি বা এতদ্দর্শনেই সেই মহানুভব মুনিবর, দুহিতা শকুন্তলার প্রতি "কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে" এই সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই ভাবে কল্লোলিনী, দলে বলে কলেবর বাড়াইয়া মহোল্লাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর গিরিগহ্বর, ইহাদিগকে গ্রাস করিবার অপেক্ষায় আছে দেখিয়া, স্নেহশীলা ধরিত্রী আপনার সুবিশাল ক্রোড় বিস্তার পূর্ব্বক ইহাদিগকে বিনাশের পথ হইতে রক্ষা করিলেন। ইহারাও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তন্মধ্যে শয়ান রহিল। তাই ইতঃপূর্ব্বে ইহাদের সেই নীরব প্রশান্ত ভাব দেখিয়াছিলাম। অকস্মাৎ এ মূর্ত্তি কেন? সে সুকোমল ক্রোড় ছাড়িয়া আসা কেন? ভাইত! প্রেমে পাগল প্রাণকে কোন

রমস্‌ডাল

জননী উৎসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছেন? যেমন ক্রোড় ছাড়া, আর অমনই পাষাণের গায়ে পড়া- তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হইয়া একগতির মুখে আপনাকে ঢালিয়া দেওয়া। এ গতির গতিবিধি জানা নাই, তবু চলা চাই। সে তিমিরাচ্ছন্ন

বিকট মুখব্যাদান দেখিয়া, কখনও ভয়ে থরথর, ত্রাসে জড়সড়, আবার অভিমানে খরতর, দৃঢ়তায় মহত্তর—কখনও বা বিষাদে ছলছল, উচ্ছ্বাসে উচ্ছৃঙ্খল, আনন্দে টলমল, বিস্ময়ে ঢল ঢল ভাব! এদিকে গিরিগুহার ধারণা ছিল যে, তরলমতি অবলা-জাতিকে সে অক্লেশে কবলসাৎ করিয়া রাখিতে পারিবে; কিন্তু কার্য্যে তার বিপরীত দেখিল। সময়ে যাহাকে সামান্য গণ্ডূষের মধ্যে পূরিয়া রাখা যায়, অবস্থাভেদে তারই আবার দুর্জ্জয় পরাক্রম প্রকাশ পায়। বিশেষ প্রেম যখন মনে জাগে, তখন দুর্ব্বলা তরলা জনে, কিই না অসাধ্য সাধন করিতে পারে; তাহা জগজ্জনেই জানে। এই যে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া ঝাপটিয়া পড়িতেছে, আর সেই গুহার গণ্ডস্থল লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া, চণ্ডী হুঁ হুঁ শব্দে ঝটিতি চলিয়া যাইতেছে; কে এর গতিরোধে কাহারও ত ক্ষমতায় কুলাইতেছে না। আজ গিরিগুহা দেখিলেন, যে হাল্‌কা পালেও যখন দম্‌কা হাওয়া লাগে, তখন তার তড়িৎ-গতি সামাল করা কেবল সামর্থ্যের কাজ নয়। অতএব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভূধর-গহ্বর, সংগ্রামে ইস্তফা দেওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। তখন কলনাদিনী কলকণ্ঠে তাহার স্তুতিবাদ করিতে করিতে পথ চলিল। শুনিলাম, এ রাজ্যে নাকি সচরাচর, সরিৎপতি স্বয়ং আসিয়া নিকটবর্ত্তিনী প্রণয়িনীগণের

রম্‌স্‌ডালের দ্বিতীয় দৃশ্য

সহিত সাক্ষাৎ করেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর ফিয়ড্‌কেই ইহাদিগের আনয়নের ভার দিয়া থাকেন। আমরা তখন ফিরিয়া গিয়া এই প্রিয়-সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিব,—

সংকল্প করিলাম। ফিয়ড্ বেচারার ঘাড়ে আজ বোঝা ভারি। একে আমরা এতগুলি নরনারী তার বক্ষের উপরে ত আছিই, তাতে এত সব সখীসমেত শৈলকুমারীও সঙ্গে। দেখিলাম, দূর হইতে চিরবাঞ্ছিত বল্লভের দর্শনমাত্র সেই প্রেমবিহ্বলার নবীন প্রাণ সমগ্র মাধুর্য্য-রসের আতিশয্যে যেন সংজ্ঞাহারা, আর সুহৃদবর ফিয়ড্ অমনই হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক, উভয়পার্শ্ববর্ত্তী কৌতূহলী মহীধর দর্শকমণ্ডলীকে যেন বলপূর্ব্বক সরাইয়া দিয়া, আপনি তাঁহাকে সসম্মানে আপন বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছেন। আর আর সীমন্তিনীরা মন্থর-গমনে তাহার পথ অনুসরণ করিতেছে। তারপর ইহাকে প্রিয়সখার অঙ্কশায়িনী করিয়া দিয়া আপনি অদৃশ্য হইলেন। সেই অঙ্গস্পর্শে সিন্ধুরাজ কি বলিতেছেন—

"তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণঃ।"

আর শৈলসুতার "মনঃ সান্দ্রানন্দং স্পৃশতি ঝটিতি ব্রহ্ম পরমম্" একেবারে চিন্ময়ে লয়। ভাবিলাম, এ দেখা ত শুধু দেখা নয়, কত শেখা। আজ দেশভ্রমণের সখ্ সার্থক মনে হইল ! এজন্য এই অর্থ-ব্যয়, আর অনর্থক ভাবিতে পারিলাম না। এমন ভাবে সেই মহান্ অস্তিত্বে আপনাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে, কেবল প্রেমিক ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণই পারিয়াছিলেন। তাই রসজ্ঞ কবিচূড়ামণি

"চণ্ডীদাস কহে, সে ত এক হয়ে
হয় বা না হয় ভিন্ন।
বিরলে বসিয়া দুহুঁ মিশাইয়া
গড়ল একই তনু॥"

নয় ত এমন কথা আর কে বলিতে পারে ?

পরদিন (Romsdal) রমস্ডাল নামক স্থান পরিদর্শন। প্রাতেই হাস্যবদনে আর এক ফিয়ড্ ভাইয়া আসিয়া হাজির। আমাদিগকে তাঁর জন্মভূমির চারিদিকের যা-কিছু শোভা-সম্পদ, দেখাইবেন বলিয়া, নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদের বিপুল যানকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁর অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন। পথে ছোট বড় কতক-গুলি দ্বীপ গ্রাম্যবধূদের মত জলে গা ঢাকা দিয়া, মাথা তুলিয়া—লীলাভরে এই অজ্ঞাতকুলশীল জলযানকে নিরীক্ষণ করিতেছিল ;—দেখিয়া সে, চতুরালী করিয়া, উহাদের মাথায় জল ছিটাইয়া দিয়া একটু রসিকতা করিল। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, আমাদের মতে ইনি "শি" নন,—"হি," সুতরাং এ মতিভ্রমে ইঙ্গ-বঙ্গদল হাসিবেন না !

কিন্তু কাপ্তান সাহেবের, এ বেয়াদবি বরদাস্ত হইল না ; তিনি এর কাণ মলিয়া দিয়া, একে অন্য পথে লইয়া চলিলেন। আমাদের ফিয়ড্ গাইড্ এই কাণ্ড দেখিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। তার পর থেকে আর সোজা পথে যাওয়া নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথা হইতে কোথায় যে চলিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কখনও দেখি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ মাথার উপরে, আবার কখনও কেবল ঘন তরুরাজি পথের দুই ধারে। এই ভাবে ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই চারিদিকের শ্যামল শোভায়, আর ফিয়ডের জন্মভূমির নীলাভায়, চক্ষু যেন এক অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, যদি স্বয়ং ভগবানের কখনও মর্ত্যধামে অবতরণ আবশ্যক হয়, তবে এমন স্থানেই হইবে নিশ্চয়। এবারে পারে যাইতে আর বিলম্ব নাই দেখিয়া, ফিয়ড্ মহাশয়, আমাদের বৃহত্তরীকে তার তড়িৎ-গতিকে একটু সামাল করিতে অনুনয় করিলেন ; কিন্তু অন্যমনস্কতা তার এক মস্ত দোষ। কেহ হুঁস না করিয়া দিলে, কখন যে কোন্ অপথে গিয়া অসময়ে প্রাণটা বিসর্জ্জন দেয়—তার খেয়ালই নাই। একা হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সর্ব্বদা বহু লোক-লস্কর লইয়া চলাই যে তার ব্যবসা। এস্থলে সেই আবার যখন সকলের ভরসা, তখন অমন হাল-ছাড়া গোছ চলা চলে কি ? ভাগ্যি কাপ্তান হেন বিচক্ষণ জন,—সদাই এর তত্ত্বাবধানের ভার লন, তাই বিপত্তির দিনেও এর বাঁচিবার আশা থাকে।

দূরে যাইতে হইবে না বলিয়া, পারে আসিয়া আর গাড়ীঘোড়ার বড় একটা হাঙ্গামা দেখিলাম না। সখ রক্ষা করিবার জন্য কেবল, দুই একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

এখানে একটি নরওইজীন্ পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমরা একখানা পরিচয়-পত্র সঙ্গে আনিয়াছিলাম। একটি গাইড্ও সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাকে ঠিকানা বলাতে, সে একখানা গাড়ী ডাকিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়া, ঠিক সেই বাড়ীর সদর দরোয়াজায় হাজির করিল। আমাদের নাম লেখা কার্ড পাঠাইবামাত্র একটি তরুণবয়স্কা রমণী আসিয়া সাদরে আমাদিগকে ঘরের ভিতরে লইয়া গেল। মেয়েটি দেখিতে যে বড় সুন্দরী তা নয়, তবে তার স্বভাবের একটি মাধুর্য্য যেন সকল মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দর্শনেই সে আমাদিগকে কেমন একটু আপনার করিয়া ফেলিল। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজীতে সে এমনি মিষ্ট স্বরে কথা বলিতেছিল যে, ভাল ইংরাজী বলা মুখের কথায় আমাদিগের মনকে এতদিন এমন মুগ্ধ করিতে পারে নাই। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বুঝিলাম যে, এর মা বাপ নাই, খুল্লতাতের সঙ্গে থাকে ;

তাই এর প্রতি আরও মায়া হইল। ঘর-বাড়ী ভারি ফিট্‌ফাট্ দেখিলাম। সে একাই সব তত্ত্বাবধান করে। আমাদিগকে 'ইণ্ডিয়া'র বিষয় কত কি প্রশ্ন করিল এবং আমাদের উত্তর শুনিয়া—সে দেশ দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য জানাইল; কিন্তু সে আশা যে কোন দিনও পূর্ণ হইবার নয়, তাও সে জানে—বলিল। তারপর, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, বল দেখি তোমাদের যদি দৈবাৎ ঘড়ী বন্ধ হইয়া যায়, তবে তোমাদের বেলার ঠিক পাও কি করিয়া?" মৃদু হাস্য করিয়া সে উত্তর করিল, "তা কি জানেন, আমরা কাজ-সারা দিয়া সময়ের ঠিকানা করি। ঘড়ীর কাঁটার মত আমাদের কাজ চলে; কাজেই ঘড়ী দেখিবার দরকার হয় না। এই আলোর ক'মাস আমরা দুই তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমাই না। তারপর যখন অন্ধকারের দিন আসে, তখন আমাদের বাকি ঘুমটা পোষাইয়া নেই। তখন যদি আমাদের দুরবস্থা দেখেন, ত' আপনাদের দুঃখ হবে। সকল সময়েই কৃত্রিম-আলোর সাহায্যে ঘরের বাইরে যাইতে হয়। তখন লোকজনের সঙ্গে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করা ভারি দুর্ঘট হইয়া পড়ে। তাই যে যার বাড়ী বসিয়া, নিপুণ কাজে দিন কাটায়। গাড়ীঘোড়া তখন রাস্তায় চলিতে পারে না। পায়ে চলাও দায়, কেন না দুই চার ফুট বরফ রাস্তায় সর্ব্বদা থাকে, কখনও আবার তার চেয়েও বেশী। তাই Sledge নামক একরকম কাঠের গাড়ী, হরিণে টানিয়া যায়—তাতে ক'রেই নেহাৎ যাদের ঘরের বাহির না হইলে নয়, তাদের কাজ চালাইতে হয়। তখন গৃহপালিত জীবজন্তু কেহই চরিয়া খাইতে পায় না, সব ঘরের ভিতরে বাঁধা; আর এদের ছমাসের খাদ্যের যোগাড় আগে হইতেই রাখিতে হয়। আমাদের খাওয়ার জিনিষ তখন কিছুই মিলে না। শিকারের পশুপক্ষীর মাংস নুন দিয়া শুকাইয়া রাখি। যথেষ্ট যব, রুটীর জন্য মজুত রাখা চাই; আর আলু ত অপর্য্যাপ্ত রাখিতেই হয়। তাজা কোন দ্রব্য খাওয়া, তখন আর আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। এই যে এত সব শস্য দেখিতেছেন, এর চিহ্নও থাকিবে না; এই সবুজ রঙই আর দেখা যাবে না। জুন হইতে সেপ্টেম্বর অবধি, আমাদের যত কিছু সুখসুবিধা, সব তখন যাবে। তবে বিধির এমনি মঙ্গলবিধান যে, এই তিন মাসের ভিতরই শস্য বোনা, পাকা, কাটা সব শেষ করা যায়।"—বলিয়াই আমাদের লইয়া সে ঘর হইতে হল ঘরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমরাও ধীরপদে তাহার পশ্চাৎগামী হইলাম। সে ঘরে অনেক দ্রব্যজাত বেশ বিশিষ্ট মত সাজান ছিল। তার ভিতর হইতে একখানা পুরাণ পাদুকা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের কাছে আসিয়া বলিল—"জানেন;—এইটি আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহীর পায়ের

পরিত্যক্ত চিহ্ন বলিয়া এত যত্নে রক্ষা করিতেছি, ইহা দেড়শত বৎসরের পুরাতন"। আমরাও তখন, সেই বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে সম্মান জানাইতে, উহা হাতে ছুঁইলাম এবং তারপর যথাস্থানে স্থাপন করিলাম। এতক্ষণ অবধি খুল্লতাত মহাশয় বড় একটা মুখ খোলেন নাই, সেটা তার ইংরাজী ভাষার অজ্ঞতা নিবন্ধন নিশ্চয়ই। আমরা ভদ্রতার খাতিরে দুই চার কথা তাঁকে বলিতেই তিনি মাথা নাড়িয়া, হাতের দিকে আকার ইঙ্গিতে একটা মস্ত "না"র সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে সে কথা বিনা কথায়ও বেশ স্পষ্টই বুঝাইয়া দিলেন। তারপর, যতটুকু সময় আমরা সেখানে ছিলাম, তিনি কখনও মৃদুমন্দ হাসিতে—কখনও একটু কৃত্রিম কাসিতে—আমাদিগের কথায় যোগ দিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বিদায়ের বেলা আমাদের নাম ধাম লিখিয়া আসিতে হইল; যদি কালে ভদ্রে আবার আসি, তবে খবর পাইলেই দেখা করিবেন বলিয়া। আর, কচিৎ ভবিষ্যতে, যদি তাঁদেরই সুদূর ভারতবর্ষে যাইবার সুযোগ ঘটে, তবে আমাদিগকে স্মরণ করিবেন, নিশ্চয়;—এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া, এবং আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া—বাহিরে আসিলাম। তাঁরা দুই জনে সঙ্গে আসিয়া আমাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।

গাইড্ ভাবিল, 'যখন বিদেশীকে হাতে পাইয়াছি, তখন বক্‌সিস্‌টা একটু ভারি হাতে নেওয়াই যাক্ না কেন!' মনে মনে এই ফন্দী আঁটিয়া, আমাদিগকে একটু এদেশ্‌টা ঘুরিয়া দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। আমরা মহা তুষ্ট হইয়াই তাহার এই আবেদন মঞ্জুর করিলাম। আর তাহাকে পায় কে? অনবরত, আশে পাশে ঘর বাড়ী, গাছ পালা, রাস্তা ঘাট সমুদায়েরই ইতিহাস—সেই 'ডিকি বাক্সে' বসিয়া, বলিয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে আবার গাড়ী থামাইয়া স্থানবিশেষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করাইতেছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে সকল কথা সবই যে আমাদের কাণের ভিতর প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল, এমত বলা যায় না। কেন না বাহিরের এই স্নিগ্ধশ্যামল শোভা নানা কথা মনে জাগাইয়া তুলিতেছিল। ভাবিতেছিলাম—"তাইত! এ দেশের লোকেরাও কি সেই 'শস্যশ্যামলাং মাতরম্'কে দেখিতে পায়? এদের মাও কি তেমনই সন্তানবৎসলা? এরা কি মায়ের সুসন্তান!—না কুসন্তান? মায়ের দেওয়া—খাবার, কাপড়েই এরা মানুষ?—না আমাদের মত পরমুখাপেক্ষী দীনদুঃখী নিতান্তই বেহুঁস্। যাইতে যাইতে কত ভাবে কত লোককে চলাফিরা করিতে দেখিলাম, সকলেরই সমান প্রসন্নমূর্ত্তি। তাহাতেই মনে হইল যে, এরা আদৌ দুঃখের

বার্ত্তা জানে না, নিশ্চয়ই বড় সুখী। এমন সময় গাইড্ বলিল, 'আর বেশী দূরে গেলে দেরী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, অতএব প্রত্যাবর্ত্তনে আমাদের সম্মতি আছে কি না?' আমরা ফিরিয়া যাওয়াই ঠিক করাতে, কালবিলম্ব বিনা ভিন্নপথে ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাণী-হিসাবে বক্‌সিসের ব্যবস্থা হইলে, আমাদের পথপ্রদর্শকের আজ প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক পাওয়া উচিত। অনর্গল বাক্যব্যয়ে

হার্ডাঙ্গর্—ক্রুডেফোর্ড্

বেচারা যেন কিছু বেহালও হইয়াছিল। এমন স্থলে দস্তুর মত দিতে গেলে, দয়া-দাক্ষিণ্য ব'লে কিছু থাকে না, বাক্যের হিসাবটা না হয় এখন ছাড়িয়াই দিলাম। ইতি চিন্তায় কারুণ্য রসে কিঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া, দানক্রিয়া সুসম্পন্ন করা গেল। সে ব্যক্তিও আশাতীত ফললাভে, হৃষ্টচিত্তে আমাদিগের ইষ্ট কামনা করিতে করিতে বিদায় লইয়া অদৃশ্য হইল।

আমাদের ভাসমান গৃহে ফিরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দেখি—আজ সরিৎপতির মেজাজ তত সরিফ্ নয়, বড় যেন উগ্রভাব। এতদিন ইঁহার সহিত বাস করিয়া এইটি বুঝিয়াছিলাম যে, এঁর স্বভাবটা একটু খাম্‌খেয়ালি গোছের। কিসে হাসেন, কিসে কাঁদেন,—কেন নাচেন, কেন গান,—কখন ঘুমান, কখন যে জাগেন—কিছুরই ঠিক নাই। হাঁ, মহানুভব মাত্রেরই, কিছু না কিছু বিশেষত্ব থাকেই। আমরা অল্পমতি, সে সমুদায়ের বিচার না করিলেই ভাল হয়। কিন্তু আমাদের চোখেও যদি ঐ সব মহাজনের দুই একটা দোষ ত্রুটী পড়ে, তা কি বলিতে নাই? আমরা যখন দেখি যে, তিনি রত্নাকর হইয়াও, অতিথি-সৎকার জানেন না, তখন একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে

পারি না। এই যে এত লোক তাঁর সীমানা দিয়া দিনরাত আনাগোনা করিতেছে, কৈ কাকেও ত এক কণা দানা দেওয়া দূরে থাক্, এক ছিটা নুন দিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না! বরং উল্টাই করেন, যাত্রীরা যা কিছু সঙ্গে আনে, মাঝে মাঝে তৎসমুদয় লুটপাট করিয়া আত্মসাৎ করিবারই চেষ্টা বেশী। মণিমুক্তায় যাঁর ভাণ্ডার বোঝাই, তাঁর এই পরস্ব-হরণের প্রবৃত্তিতে, আমাদের দেশের ন্যায়শাস্ত্র সায় দিতে পারে কি? এমন কি সামান্য আহার্য্য-সামগ্রী পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি। এই এক দোষে এঁকে অনেকেরই চোখে এমন বিষ করিয়া রাখিয়াছে, যে পারতপক্ষে আর তারা এঁর মুখদর্শন করিতে চায় না। সেই যে কথায় বলে "হাতে মারেন না ত, ভাতে মারেন" সেই দশা। আজন্মকাল ধরিয়া তাঁর এই নিষ্ঠুর লীলা চলিতেছে, আজ অবধি ইহার প্রতিকারের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। আশ্চর্য্য! সমস্ত রাতই তাঁর ডাক হাঁক্ চলিল।

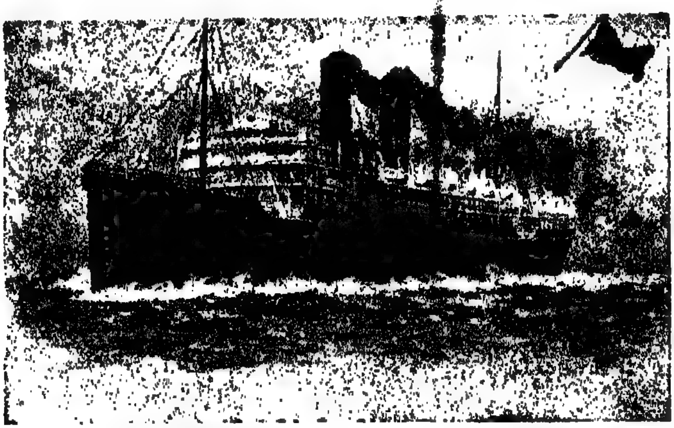

দুই-স্ক্রু যুক্ত "ম্যাণ্টুয়া" জাহাজ

প্রত্যূষে আচম্বিতে প্রিয়বয়স্য ফিয়ডের সাক্ষাৎ পাইয়া যেন সাপের মাথায় ধুনি পড়িল। জলযানের আরোহীদিগের অধিকাংশেরই ক্লিস্ট মুখের কাতরভাব দেখিয়া, তিনি যেন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অনুগত জনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা,
(তুমি যখন) মারিলে মারিতে পার
তখন রাখিতে কে করে মানা।"

আর মুখে কথাটি নাই। রাজোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন নাই বলিয়া সিন্ধুরাজ

বড় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইলেন। সকল দম্ভ দূরে গেল, মাটীর মত মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু প্রিয় বয়স্তের তবু মন উঠিল না। তিনি সেদিনকার মত বন্ধুর সহবাসে বীতস্পৃহা দেখাইয়া আনমনে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে ফিরিয়া চলিলেন। আমরা তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না। ইঙ্গিতে আমাদের তরী ঘুরিয়া চলিল। তখন বিজ্ঞাপনের আশ্রয় লইলাম। তাতে জানিলাম যে, এই ফিয়ড্ আমাদিগকে "Gudvangen" নামক স্থানের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। তারপর সেখান হইতে অশ্বযানে অর্দ্ধ-পথ চলা। যে ইচ্ছা করিবে, সেই অর্দ্ধ-পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জাহাজে জলপথে সে স্থানের শেষ সীমায় পৌঁছিতে পারিবে। যার ইচ্ছা সেখান হইতে রেল গাড়ীতে গিয়া, তার পরদিন আসিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হইবে। এস্থলে যে অনেকেই রেলপথে যাওয়া স্থির করিলেন, সেটা দেশ দেখিবার উৎসাহে যত না হউক, জলনিধির গত রাত্রের গরম মেজাজের জন্যই বেশী।

ফিয়ডের এলাকা শেষ হইতে না হইতেই, কুক কোম্পানীর ভেরীর ভাঙ্গা-গলার বিকট আওয়াজ কাণে গেল। আজ বহুদূরের পথ যাইতে হইবে বলিয়া ভাল ভাল ঘোড়ার গাড়ী হাজির রহিয়াছে দেখিলাম। অশ্বগণ তেজ সংবরণ করিতে না পারিয়া ক্রমাগত নাচিতেছে, দাঁড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছে না। জল ছাড়িয়া জমিতে পা দিতেই, বন্ধুভাবে কে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। তখন ভাবিলাম, কি কুক্ষণেই বিধি আমাদের গায়ে কাল রঙ্ মাখাইয়াছিলেন! তার আকর্ষণেই না এ সকল স্থানের পথ-প্রদর্শকগণ হাস্যবদনে আমাদের সন্নিধানেই আসিতে ব্যস্ত। তা, যারা স্থানের ইতিহাস বলিয়া দেয়, চিত্রপরিচয় করায়, তারা কিছু মন্দ লোক নয়। বরং সহযাত্রীদের অনেকেরই আমাদের প্রতি কুটিল-কটাক্ষ যে, আমরা গাইড্ ভায়াদের একচেটিয়া করিয়া লইয়াছি।

আজ যে উপত্যকার মধ্য দিয়া যাইতেছি, তার দুই দিকেই দুইটি স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী প্রবাহিত। মনে হইল এই যে, চতুর্দ্দিকে ধ্যানপরায়ণ যোগিগণ, যুগ যুগান্তর হইতে সমাধিস্থ হইয়া আপনাদের পবিত্র দেহকে পাষাণবৎ করিয়া রাখিয়াছেন, বুঝিবা তাঁহাদেরই সুকৃতির ফলে এই স্থান দিয়া নিরন্তর এই পুণ্যপ্রবাহ বহিয়া থাকে। কাল অনন্ত, আর সৃষ্টিলীলাও অপরিমিত, তাই এই ক্ষুদ্র প্রাণ এই স্থানের কিছুরই সন্ধান পাইতেছে না, অভূতপূর্ব্ব রহস্যে পড়িয়া যেন বিমুগ্ধ হইয়া আছে।

এমন জায়গায়, গাইড মহাশয়ের বেশী পাণ্ডিত্য দেখাইবার উপায় নাই। কেন না প্রকৃতি দেবীর, এত সব কারিগরির, সন তারিখ তাঁর বড় জানা নাই। সুতরাং দৃশ্য বস্তুর বিষয়ে নূতন কিই বা বলিবেন। তিনিও দুই চোখে যা দেখিতেছেন, আমাদেরও তেমনি দুটী চক্ষু আছে। আজ বেচারা যেন একটু কাবু হইয়া, কেবল ভাবিতেছে যে কখন বা এই অকৃত্রিমের মধ্যে কিছু কৃত্রিমের দেখা পাইবে; তখন তার কণ্ঠস্থ ঐতিহাসিক বিদ্যাটা একবার আমাদের কর্ণগোচর করাইয়া, প্রকৃতি দেবীর নিকট, বাধ্য হইয়া এই বেকুবী স্বীকারের প্রতিশোধ লইবে। এমন সময় বিঘ্ন-বিনাশন বিধি তার প্রতিবিধান করিলেন, দূর হইতে এক অট্টালিকার কিয়দংশ দেখা গেল; অমনই সেই বাগ্মীর বশীকৃত রসনা, এতক্ষণকার পুঞ্জীকৃত বাণী যেন একবারে উদগীরণ করিবার উপক্রম করিল। প্রথমে আমরা এই বাক্যস্রোতের উদ্ভব নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই নাই। কারণ বক্র পথের অদ্রিরাজি মুহূর্ত্তের জন্য সে অট্টালিকা অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা ভাবিলাম 'লোকটা বকে কি ?' খানিক পরে চাহিয়া দেখি যে সে বাতুল নয়, সম্মুখে বাড়ীই বটে। দেখিতে দেখিতে সে হর্ম্ম্য-সমীপে আসিয়া উপনীত হইলাম। আগেই বলিয়াছি যে, ইংরাজ জাতির, পরিপাটীরূপে আহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার স্থানের অসদ্ভাব কোথাও হইতে পারে না। ইহা ভোজনপ্রিয়তার পরিচায়ক, কি কার্য্যকুশলতার নিদর্শক ? তা যে যাই মনে করুক, পর্য্যটকের পক্ষে এ অবস্থা যে সুবিধাজনক, সে তো স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের গন্তব্য স্থানের এইটিই বিশ্রাম স্থল। এখান হইতে কেহ কেহ অগ্রসর হইবার পক্ষে, কেহ বা পুনরায় অর্ণবপোতে প্রত্যাবর্ত্তনেচ্ছু হইলেন। আমরা প্রথম দলে রহিলাম। এখানকার আহারবিধি যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল, ইহা বলা বাহুল্য। বাহিরে আসিয়া দেখি, নানাবিধ নৃত্যগীতবাদ্যের চর্চ্চা চলিতেছে। ভ্রমণকারীদের চিত্তবিনোদনার্থ আসেপাশের গরীবদুঃখীরা মিলিয়া এ ব্যবস্থা করিয়াছে। মেণ্ডেলীন্ নামক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গান বড় মিষ্ট শুনাইতেছিল। সামান্য সাজগোজ্ করা, কৃষকদুহিতারা, যে তালে তালে তাহাদের কঠোর পদ-বিন্যাস করিতেছিল, তা'ও মন্দ লাগে নাই। বেহালা, ফ্লুট্, ক্লেরিওনেট্ ইত্যাদি হরেক রকমের যন্ত্র হইতে শব্দ উত্থিত হইয়া কেমন একটা হট্টগোল বাধিয়া গিয়াছিল। কোন্‌টা যে শুনিব, ভাবিয়া পাই না। অবশেষে যার যার পথে যাইবার সময় সমাগত হওয়ায়, এ আমোদ বন্ধ করিতে হইল। যার যাতে মনস্তুষ্টি হইয়াছিল সেই অনুসারে দক্ষিণা দিয়া, এই দীনদুঃখীদিগকে বিদায় করিল।

এবারে আরও ৬ ঘণ্টার পথ ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়া নির্দ্দিষ্ট হোটেলে রাত্রিবাস। পর দিন রেলগাড়ীতে অবশিষ্ট রাস্তা শেষ করিয়া জাহাজ-ধরা। এই গিরিসঙ্কুল পথের দুই ধারে কৃষকদিগের শস্যক্ষেত্র সকল শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। মাঝে মাঝে এই শ্যামল সুন্দর শোভা দেখিয়া, ভ্রম হইতেছিল, বুঝি বা আপনার দেশেই ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। কেন না সেই ভুবন-মনোমোহিনীর ত দেশ বুঝিয়া বেশবিন্যাসের পার্থক্য নাই। এখানেও তাঁর—

"নীলসিন্ধুজল ধৌত চরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল।"

তিনি এখানেও "পুণ্য শুভ্র তুষারকিরীটিনী" কিন্তু যখন তাঁর কৃষকদের নগ্ন পদে, পাদুকা সংযোগ; তাদের অনাবৃত অঙ্গে সভ্যতাসূচক সার্ট সংলগ্ন, যদিও তা নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন ও জীর্ণ শীর্ণ; পরণের শাদা ধুতির জায়গায় পায়জামা সন্নিবেশিত, আর খোলা মাথা, সোলার হেটে আবৃত; এবং তৎসঙ্গে কৃষকজায়ার অঞ্চলোচিত অঙ্গে জামা

গস্তাঞ্জেন্—প্রথম দৃশ্য

আঁটা, রুক্ষ কেশে বেণী বাঁধা, তার আজানুলম্বিত অনতিদীর্ঘ মোটা বুনট্ শাটীর বদলে কৃষিকার্য্যনিবন্ধন বিমলিন ঘেরোয়া ঘাগ্‌রা দেখা যায়, তখন কি আর দেশ কি বিদেশ, এই ভুল ভাঙ্গিতে দেরী লাগে? তারপর বাড়ীঘর গাইবাছুরের ত কথাই নাই। কই বা সে খড়ের ঘরের কাঁচা মেজে, লেপা পোঁছায় সদাই ভিজে, এককোণেতে গোলাঘর,

তাতে বোঝাই করা ধান জড়, ঢেঁকিতে সে ধান ভানা, তারই খুদকুঁড়া দিয়া প্রস্তুত গাই-বলদের জাব্‌না—কিছুই এখানে দেখিলাম না। এদের আছে পাকা ইঁটের পাকা দালান, আঙ্গিনাতে ফুলের বাগান, কলেতে চাষবাস করা, ক্ষেতের চারিধারে আঙ্গুরের বেড়া, রাস্তা ঘাট সব দুরস্ত, গাই-বাছুর সব মস্ত মস্ত। এই সব দেখিতে দেখিতে ছয়টা ঘণ্টা বেশ কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সেই নির্দ্ধারিত হোটেলে আসা গেল। আমাদের যাওয়ার পরেই, সেই পান্থশালার তত্ত্বাবধায়ক স্বয়ং আমাদিগের তত্ত্ব লইতে আসিলেন। আমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া আমাদিগের নিজ নিজ কামরার নম্বর জানিবার জন্য একটা বোর্ডের সামনে লইয়া গেলেন। পূর্ব্বেই তারযোগে আমাদিগের নামের তালিকা কুক্ কোম্পানী ইহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। তখন নম্বর জানিয়া, বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় সে ঘরের পরিচারিকাকে ডাকা হইলেই, এক প্রবীণা অঙ্গনা আসিয়া আমাদের আজ্ঞার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার সেই ভাষাবিভ্রাট্! সে বেচারা হাতমুখের চালনায় যতটুকু পারা যায়, বুঝাইয়া আমাদিগকে ঘরে লইয়া চলিল। পথ-

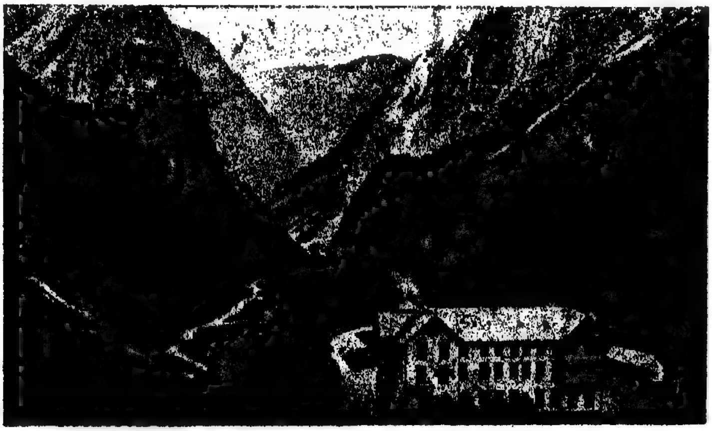

"ষ্ট্যাল্‌হীম হোটেল্"—গভাঙ্গেন্‌

মধ্যে আমাদিগের জাতিকুলশীল জানিবার একটা উগ্র বাসনা, যেন তার কৌতূহল-বিস্ফারিত নেত্রের দৃষ্টিতে বাহির হইয়া পড়িতেছিল। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া, বামে দক্ষিণে ঘুরিয়া ফিরিয়া, তবে ঘর পাওয়া যায়। বিখ্যাত হোটেল হইলেই তার কামরার সংখ্যাও বহু হইয়া থাকে।

আমরা জাতে বাঙ্গালী, তাতে স্ত্রীলোক, বে-টাইম্ খাওয়া শোয়াই আমাদের অভ্যাস; এসব বিষয়ে কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থা সব সময় আমাদের ভাল লাগে না, পোষায়ও না। অথচ এদের কাছে নিজেদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে, কেমন আত্মগৌরবে আঘাত পড়িল, তাই বিশ্রামসুখে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া, আহ্বানমত সকলের সঙ্গে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। এ হোটেলে প্রতিদিন অনেক বাহিরের লোক এ সময় আহার করিতে আসে। এত অজানা মুখ দেখিয়া কেমন একটা অশোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। নরওইজীনদের কাছে যেন আমরা বিধাতার এক নূতন সৃষ্ট বস্তু হইয়া পড়িয়াছিলাম। তারা আমাদের যত দেখে, আঁখির পিপাসা যেন আর মিটে না। এত নজর দিলে কি আর প্রাণ বাঁচে? কাজেই অশোয়াস্তি। আহার শেষ হইতে না হইতেই চট্পট্ উঠিয়া ঘরে চলিয়া আসিলাম। বড়ই শ্রান্ত হইয়াছিলাম, শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু নোটিসে যে লেখা ছিল, ৫টা ভোরে রেল ছাড়িবে, সেই তাড়ায় ভাল ঘুম হইতে দিল না। বালিশের নীচের ঘড়ী তোলা, দেখা এবং পুনঃ যথাস্থানে রাখা, এই কর্ম্মেতেই ঘুমের দফা রফা! পরিচারিকা আসিয়া জাগাইবার অনেক আগেই আমরা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিলাম। শীতের দেশের সুখের শয্যা ছাড়িয়া, সকাল সকাল উঠা ত সোজা কথা নয়? তাতে মনের জোর চাই। তারপর, ভোর বলিতে, এদেশে সেই স্নিগ্ধ মনোহর উষার আলো নাই, যে দেখিয়া অসময়ে ঘুম ভাঙ্গার সকল কষ্ট দূর হইবে। তা যাক্, দেশ দেখিতে আসিয়া যে কেবল নিছক্ সুখই পাব, এমন কি কথা—আর তা হবার যো নাই!—দুঃখ যে সুখের নিত্য ভাণ্ডারী! এই বলিয়া মনটাকে প্রবোধ দিয়া, যথাশক্তি অন্তরে বল-সঞ্চয় করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। এ হোটেলের গায়েই রেল যাতায়াত করে, এই সুবিধার জন্যই এর এত খাতির।

আজ ট্রেণ বেশী বেগে চলিতে পারিতেছে না। ক্রমাগত সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ, (Tunnel) রাস্তা দুর্গম। ক্ষণে আলো ক্ষণে অন্ধকার, যেন এক বৈদ্যুতিক খেলা চলিতেছে। গাড়ীর ভিতরে মহা হাসির ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে, আচম্বিতে একেবারে দেহের বিলোপ। যেন কোন ফোন্ (Phone) সহযোগে কলে কথা চলিতেছে। সতত পরোপকারী গাইড্ বেচারী অন্য গাড়ীতে ছিল, আমাদিগের কুশল জিজ্ঞাসার জন্য, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে আমাদের ইচ্ছামত আরাম উপভোগের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিলেও, ভদ্রতার খাতিরে

হাসিমুখে তাকে বসিতে বলিতে হইল। জানি, যে আজ তার বক্তৃতা বহুক্ষণ চলিবে। কেন না কত নদী, কত হ্রদ, কত পাহাড়, কত পর্ব্বত, কত পল্লী, কত জনপদ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, তাহা সে হোটেল রক্ষিত মানচিত্রে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এ সকলের নাম, ছাই মনেও থাকে না—উচ্চারণ ত ঠিক হয়ই না, শুধুই শোনা, তাও আবার সকল সময় হইয়া উঠে না—এই বড় আপ্‌সোস্‌। কথায় কথায় সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল "আমাদের দেশটা দেখিতে কেমন ? এতই কি সুন্দর ?" হা কপাল ! দেশের কিই বা দেখিয়াছি যে, মুখ ভরিয়া তার বর্ণনা করিব। সেই আমাদের "সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী"ই না "ভুবন মনোমোহিনী"। তার তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের কাছে দাঁড়াইতে পারে, এমন কোন্ শিখর জগতে আছে ? তার শুভ্র তুষার-কিরীটের তুলনায় আর সব লাগে কোথায় ? শুধু শোভায় কেন ? "প্রথম প্রচারিত যার বন-ভবনে, জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী" আজও তাকে দেখিতে দূর—দূর দেশান্তর হইতে দলে দলে কত কত লোক আসিতেছে ! আর আমরা অমন আপ্‌নার দেশ অবহেলা করিয়া পরের দেশে ছুটিয়া আসিয়াছি ! ছি ! লজ্জার কথা ! তবে ঐ যা বলেছি, কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজের দেশ দেখা, কলিকালের আমাদের সভ্য-সমাজের সুখী প্রাণে হয় না। তীর্থদর্শনের পুণ্যফলে তাদের তেমন আস্থা নাই বলিয়া, পথঘাটের সাবেকী ধরণের ব্যবস্থা তাদের মাপিকসই নয়। তাতে, দীনদুঃখীরও প্রাণের যে ভক্তিবল, পথের আসল সম্বল, তাও তাদের নাই। এমন অবস্থায় যদি P. & O. আর কুক কোম্পানীকে পয়সা দিলেই তারা সুখসুবিধায় এ সকল রাজ্য দেখায়, তবে পথকষ্ট-অসহিষ্ণু, সৌখীনপ্রাণ প্রলুব্ধ না হবে কেন ? অতএব আপনা হইতেই যে নিজ দোষদুর্ব্বলতা মাথা পাতিয়া মানিয়া লয়, তাকে আর পরিহাস বাক্যে মর্ম্মাহত করা সজ্জনোচিত হয় কি ? যাক্, নির্ব্বাক্ দেখিয়া সে বাক্যবাগীশ একটু ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করিল যে, "সে যে শুনিয়াছে, আমাদের দেশটা একটা বাঘভাল্লুকের মুল্লুক, তাই কি ?" আর সহ্য হইল না—অমনই গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিলাম—

"হাঁ, আমাদের দেশে বাঘ ভাল্লুক বাস করে বটে, কিন্তু তা বলিয়া তাদেরই মুল্লুক একথা মানিতে পারি না। কি জান ! দেশটা বহু বিস্তৃত হইলেই, তার ঝোপ জঙ্গল থাকবেই ; তাতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ! যদি জিজ্ঞাসা কর, ইণ্ডিয়াটা কত বড় ? তবে এক কথায় এই বলিতে পারি যে, তোমাদের মত কত নরওয়ে, তার মধ্যে অনায়াসে পূরিয়া রাখিতে পার, কেহ টেরও পাবে না। এত যে তোমরা পাহাড়ের বড়াই কর ?

তোমাদের পাহাড়ের উচ্চতা দেখিলে আমাদের হাসি পায়। তবে দুই চার হাজার ফিট্ উঁচুতেই বরফ জমে বলিয়া তার একটা বিশেষ বাহার আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি ইত্যাদির বিপুলতা ও উচ্চতা তোমরা ধারণাই করিতে পার না।"

সেও ছাড়িবার পাত্র নয়। একটু চঞ্চল হইয়া বলিল, "Lakes Madam, Lakes"। উত্তর করিলাম "তা তোমাদের মত মাঠে ঘাটে আমাদের Lakes নাই বটে, দু চারটা যা আছে তা তোমাদের নামজাদা হ্রদের চাইতে কোন অংশেই কম নয়। যা বল্‌ব! তোমাদের এই ফিয়ড্ বাস্তবিক এক অভিনব নৈসর্গিক দৃশ্য! ইহা আমাদের দেশে কেন, জগতের আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না। এর কথা শুনেই আমরা এত দূরে দেখ্‌তে এসেছি এবং দেখে খুবই খুসীও হয়েছি।"

কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত ছিলাম, বাহিরের দিকে দৃষ্টি ছিল না। এখন চাহিয়া দেখি, প্রশস্ত পাইন ফরেষ্টের (Pine Forest) মধ্য দিয়া যাইতেছি। মহীধরগণের পাষাণের কঠোরতার মধ্যে সহসা মহীরুহদিগের শাখা-পত্রের স্নিগ্ধ কোমল ছবি দেখিয়া ভাবিলাম, তাই ত!

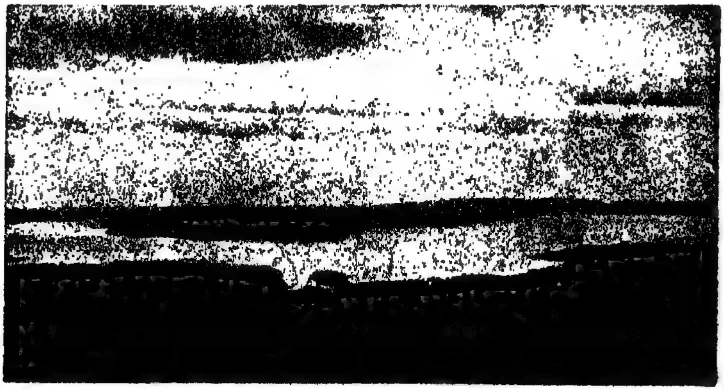

ফিয়ডের আর একটি দৃশ্য

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহর্হবিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

ফলতঃ সেই পরম পুরুষের এই লীলাবিগ্রহ কে বুঝিবে? মাঝে মাঝে আবার বৃহৎ হ্রদের জলস্রোত যেন তাঁহারই "বিগলিত করুণা" বহিয়া চলিয়াছে! শুষ্ক অচল এই

জল না যোগাইলে, কে এখানে প্রাণ ধারণ করিতে পারিত ? এখান হইতে আমাদিগের দোদুল্যমান প্রবাসগৃহ দেখা যাইতেছিল। অনেক আগেই সে আসিয়া আমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। ট্রেণের দম্‌কল বন্ধ হইলেই, সে আপ্‌নার কলে দম্ দিবে। অনেকদিন পরে আপনার বাড়ী ঘর, আত্মীয়স্বজন দেখিলে মনে যে আনন্দ হয়, আজ যেন অন্তরমধ্যে সেই স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম। আজ আর দেশ বিদেশের পার্থক্য মনে নাই, গায়ের কাল রঙের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তারাও হাসে, আমরাও হাসি। তাদেরও একটা ভাবনা গেল, আমাদেরও তাই হইল। Tender হইতে জাহাজে উঠিতেই কাপ্তেন সাহেব হাত বাড়াইয়া দিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন, পরে আমাদের পর্য্যটনের শুভাশুভ প্রশ্ন করিলেন। আমরাও যথারীতি তাঁহাকে

ইকেস্‌ডালেন্

ধন্যবাদ করিয়া আমাদের ভ্রমণ ব্যাপার যে সর্ব্বথা আনন্দদায়ক হইয়াছিল, তাহা জ্ঞাপন করিলাম। তখন আরও অনেকে আসিয়া, ক্রমাগত আমাদিগকে একই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সভ্য দেশ, কি রীতির দাস ! পাখীর মত পড়া-কথা বলা ও শোনাই তাদের অভ্যাস। আমাদের কেমন বার বার একই উত্তর দিতে দিতে বিরক্তি বোধ বোধ হইতে লাগিল। তখন হুকুমের হাসিও হয়রান হইয়া পড়িল, আর তাহা দ্বারা কাজ হাসিল হয় না। সুতরাং কেবিনের আশ্রয় লওয়া গেল। আজ London ডাকের চিঠিপত্র পাইবার দিন। এই কার্য্যের বিলিব্যবস্থাপকের নিকট গিয়া আপন

আপন চিঠিপত্র চাহিয়া আনিবার জন্য কেবিনের গায়ে বিজ্ঞাপন রাখা হইয়াছে। তাহাতে চোখ পড়িবামাত্র ছুটিতে হইল! কতদিন পরে দেশের খবর পাইব। সব মঙ্গল সংবাদ কি না, সঙ্গে সঙ্গে সে আশঙ্কা থাকাতে, প্রাণটা ছুটিলেও পাটা পিছে পড়িয়া থাকিতে চাহিল।

জাহাজের 'মেইল ডে' এক মস্ত মহোৎসবের ব্যাপার। মা আছেন—সন্তানের সংবাদের আশায় উৎগ্রীব হইয়া, স্ত্রী থাকেন—স্বামীর খবরের অপেক্ষায় মুখ বাড়াইয়া, তরুণ প্রেমাসক্ত পাগলেরা আসে একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড শূন্যভাবে দৌড়িয়া;—দূরে দাঁড়াইয়া এসব ভাবভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতে, কি যে আমোদ লাগে বলা যায় না। যার যার পদবীর প্রথম অক্ষরের পর্য্যায়ক্রমে চিঠি বাছিয়া রাখিবার নিয়ম। সভ্য দেশের সব বিষয়েই আবার পুরুষের আগে স্ত্রীলোকের পালা। সুতরাং পরবর্ত্তী জনদিগের এস্থলে উতলা হইয়া কোন লাভ নাই জানিয়া আশৈশব পুরুষজাতি এই সংযম শিক্ষা করে। আজও ইহারা, প্রাণের ভিতরে যাই করুক, মুখটা বুজিয়া, হাসিটা তাতে নিবেশ করিয়া নিজ নিজ অবসর অপেক্ষা করিতেছে। ইহা প্রশংসনীয় বলিতেই হইবে। সে কর্ম্মচারীর ঘরটী যে দূরে ছিল তা নয়, কিন্তু আজকার দিনে সেখানে পৌঁছান এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। একে লোকে লোকারণ্য, তাতে দাঁড়াইবার জায়গাটী অতি সঙ্কীর্ণ, বিধিকৃতে আমাদের গায়ের রংটা আবার কৃষ্ণবর্ণ,—কি জানি আমাদের সংস্পর্শে পাছে শ্বেতাঙ্গ বিবর্ণ হইয়া যায়, সেই ভয়ে বলপূর্ব্বক অগ্রসর হওয়ার পক্ষে আমাদের মহা অন্তরায় ছিল। যদি বা দেহের দৈর্ঘ্য তেমন থাকিত, তবুও দূর হইতে, সে লিপিদানকর্ত্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু বিধাতাপুরুষ তাতেও যে চিরবঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এদেশের এত সব দীর্ঘাকার শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে দাঁড়াইলে খর্ব্বকায় আমরা একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ি যে! যাহা হউক, কোন প্রকারে পত্রাদি হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিলাম এবং তাহা পাঠ করিয়া সকলের মঙ্গল সংবাদ জানিয়া উৎকণ্ঠার উপশম করিলাম।

হঠাৎ কেমন চটাচট্ কতকগুলা পায়ের শব্দ কাণে গেল। চাহিয়া দেখি, আমাদের খালাসী সব ছুটাছুটি করিতেছে, আর "আগুন" "আগুন" কি বলিতেছে। প্রথমে মনে আতঙ্ক হইল বুঝিবা জাহাজে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত। কিন্তু ডেকে আসিতেই দূরবীক্ষণের ধূম দেখিয়া সে ভয় দূর হইল, বুঝিলাম পারে কোথাও।

কাপ্তানের হুকুম পাইবা মাত্র তারা জলীবোট বোঝাই হইয়া, সঙ্গে সব আস্‌বাব্ লইয়া, ঝপাঝপ্ দাঁড় ফেলিয়া নিমেষে গিয়া পারে পৌঁছিল। এবং তৎক্ষণাৎ কলে জল সেচিয়া দালানের ছাদে উঠিয়া নানাবিধ উপায়ে সেই দুর্দ্দমনীয় অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। এখানে সেদিন জার্ম্মানীর সম্রাট্ তাঁহার দলবল সহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাকি প্রতি বৎসরই এই বিশেষ ফিয়ড়ে একবার করিয়া আসেন। এ স্থানটি তাঁর এতই পছন্দসই। তিনি তাঁহার শ্বেতাঙ্গ লোক লস্করকে, এই অগ্নিনির্ব্বাণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা তেমন পরিশ্রম স্বীকার করা আবশ্যক মনে না করাতে, অল্পক্ষণের মধ্যেই পশ্চাৎপদ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রায় এক প্রহর সংগ্রামের পর যখন আমাদের লোকেরা কৃতকার্য্য হইয়া, ক্লান্ত দেহে ও প্রসন্নমুখে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন শিক্ষিত সভ্য মণ্ডলীর করতালির চোটে জাহাজ যেন ফাটিতে লাগিল। এতদিন যে কালো কালো কোমিল্লাজিলার খালাসী-গুলোর দিকে তাকাইবারও কারো প্রবৃত্তি হয় নাই, আজ তাহাদের সৎসাহস ও কার্য্যকারিতা, অজানিত দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম! বস্তুতঃ আজ ইহারা না থাকিলে, হুতাশন যে আরও কত লোকের সর্ব্বনাশ

গজাঞ্জেন্—অপর একটি দৃশ্য

সাধন করিত, তাহা বলা যায় না। স্বদেশী বলিয়া, এই গরীবদুঃখীদের গৌরবে আপনাদিগকে মহাগৌরবান্বিত মনে করিলাম। আজ ইহাদের সঙ্গে একীভূত ভাবে "ইণ্ডিয়ান্" বলিতে স্পর্দ্ধা অনুভব করিলাম। বিদেশে আসিলে, দেশের যে কোন

লোকের প্রতি যে আপনার ভাব হয়, দেশে থাকিলে তেমনটি হয় না, আজ তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আমার ভ্রাতা ইহাদিগের এই অসম্ভব পরিশ্রমের কিছু পারিতোষিক দিতে ইচ্ছুক হইয়া চাঁদা-সংগ্রহের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। এবং চাঁদার বইএ সই করিয়া, বা কাহাকেও কিছু নগদ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, পাশ্চাত্য জাতি মাত্রেই যে, সে দান কার্য্য বাস্তবে পরিণত করিতে, প্রায় কখনও কালবিলম্ব করে না, বা তাহা কেবল মুখের কথায় কি পুস্তকের পাতায়ই পর্য্যবসিত হয় না, ইহা আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণীকৃত হইল। বিন্দুর সমষ্টিতেই মহাসিন্ধুর উৎপত্তি, এস্থলেও তাহাই ঘটিল। দীনদুঃখিজন তাহাদিগের শারীরিক পরিশ্রমের এরূপ আশাতীত ফল লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইল।

একবর্গ হইতে ক্রিষ্টিয়ানার দৃশ্য

আমরা বেলা ২টার সময় পারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আজ আর জাহাজের খেয়া-পার হওয়া নয়। ছোট ছোট কতকগুলি মোটার-বোট ভাড়া খাটিতে

আসিয়াছিল, তাহারই একটা দখল করিয়া বসিলাম। বস্তুবিশেষের নূতনত্বের একটা মোহ আছে ত? পারে গিয়া দুই চার পা চলিতেই সেই পোড়া বাড়ীগুলির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। আহা! বড় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! কেহ বা বসিয়া, তাদের সাধের দ্রব্যজাতের দশা দেখিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছে, কেহ বা তাহা হইতে দুই একটা আস্ত অংশ বাহির করিয়া অবশিষ্ট ভাগের জন্য তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিতেছে। সকলেরই মুখ মলিন, সকলেরই হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কেবল অবোধ শিশুর দলে আজ আর আনন্দের সীমা নাই, আজ আর তাদের ঘরে আটক থাকিতে হইবে না, জানিয়া তাহারা খেলায় মত্ত। কিন্তু খেলিতে খেলিতে যখন ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, দৌড়িয়া গিয়া, মা বোন্‌কে তাড়না করিতেছিল, আর তারা তখন কিছু দিতে না পারিয়া, সজল নয়নে শিশুদের মুখের দিকে চাহিতেছিল, তখন এ করুণ দৈন্যের দৃশ্য বড়ই অসহ্য হওয়ায় দর্শকবৃন্দ সকলেই কিছু না কিছু দিতে বাধ্য হইল।

এই ফিয়ডের আশে পাশে হাঁটিতে হাঁটিতে বহুদূর চলিয়া গেলাম। কত কৃষকের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সকলেই ক্ষণকালের জন্য আপন আপন কার্য্য ছাড়িয়া, আমাদের দিকে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, ইহাদিগের সহিত কিছু বাক্যালাপ করি। ভ্রূবিলাস-অনভিজ্ঞ অমার্জ্জিত সরলপ্রাণের সুখদুঃখের কথা কিছু শুনিয়া যাই। পরের মুখে ঠিক তেমনটি শোনা হয় না। কিন্তু ভাষা জানা না থাকাতে বিদেশের ব্যবধান এতটুকুও ঘুচাইতে পারিলাম না, এই বড় দুঃখ, সকল সময়েই মনকে পীড়িত করিতেছিল। বাক্‌শক্তি সত্ত্বেও ইহাদের কাছে বোবা বনিয়াই আছি। এদেশের পর্ব্বত-বিশেষের স্তরে স্তরে বিস্তর শ্লেট (Slate) প্রস্তর পাওয়া যায়। তাহা যন্ত্রদ্বারা বাহির করিয়া, নানা আকারে কাটিয়া, বিবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়া, দালানের ছাদ, কি মেজের কারুকার্য্যে ব্যবহার করে। ইহাতে বাড়ীর শ্রী বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করে। এ কার্য্যে যুবা-বৃদ্ধ বিস্তর লোক নিযুক্ত দেখিলাম।

তারপর পাহাড়ের উপরের জঙ্গল আবাদ করিবার ইহাদের একটা নূতন কায়দা দেখিলাম। পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ চাহিয়া দেখি, অনুমান ৫।৭ শত ফিট উপরে, জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের গায়ের গাছপালাগুলি কেমন বিনা বাতাসেই নড়িতেছে। প্রথমে কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। তার পর দেখি কি, একটা মোটা তারের মধ্যে দিয়া ২।৪ আঁটি, কাটা লতাপাতা ডালপালা

তরতর করিয়া নামিয়া আসিয়া, একেবারে কৃষকের আঙ্গিনায় পড়িতেছে। তখন বুঝিলাম যে, উপরে লোক থাকিয়া এ কার্য্য করিতেছে। ঘন বন এবং উঁচু বলিয়া উহাদিগকে দেখা যাইতেছে না। জঙ্গল সাফ হইয়া, এই কৌশলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অনেক বোঝা নীচে জড় হইতেছে। শুনিলাম, এই সকল লতাপাতা রৌদ্রে শুকাইয়া গৃহপালিত পশুদিগের শীতের খাদ্য ও শয্যার নিমিত্ত, আর ডালপালাগুলি নিজেদের ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। দেখিলাম, কিছু শুকানো হইয়া গিয়াছে, কিছু কিছু বাড়ীর চারিদিকের বেড়ার উপর ঝুলানো রহিয়াছে, অবশিষ্টগুলি মাটিতে ছড়ানো আছে। সময়মত ঘরে পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখা হইবে। আহা! শীতের দেশের দীনদুখীর কষ্ট আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। কত গৃহহীন অনাথা নাকি পথের ধারে পড়িয়া, শীতে রক্ত জমাট হইয়া মরিয়া থাকে। কাহারও যদি বা মাথা রাখিবার স্থান থাকে, তবুও আগুনের অভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। কত লোক খড়কুটার উপরে শুইয়া রাত কাটায়। সেও একদিন দুইদিন নয়, ক্রমাগত আট মাস, অর্থাৎ যত দিন বরফ-পড়া ক্ষান্ত না হয়। ততদিন খাওয়া-পরারই বা কি হাল শুনি। অনেকের ভাগ্যে শুধু সিদ্ধ-আলু আর নুন, তাও নাকি রোজ জোটে না। শিকারের শুষ্ক মাংস সঞ্চিত রাখিবার মত স্থানই বা তাদের কোথায়? এই কারণে, এই সব শীতপ্রধান দেশে, অনেক শিশু ও বৃদ্ধ প্রতি বৎসর মারা যায়। বয়স্কেরা আপন আপন শরীরের রক্তের জোরে যা বাঁচিয়া যায়। এতদিন এ সব শোনা-কথায় বিশ্বাস করি নাই, আজ স্বচক্ষে ইহাদের ঘরবাড়ী আস্‌বাব দেখিয়া, দারুণ শীতের প্রকোপে ইহাদের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশা যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। বেলা পড়িলে জাহাজে ফিরিবার মুখে, নিকটবর্ত্তী এক হোটেলে চায়ের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করা গেল। গিয়া দেখি, সেখানে আজ মহা ধুমধাম চলিয়াছে। সেই জর্ম্মনীর রাজা, আজ তাঁহার জাহাজের সকল কর্ম্মচারীদিগের এখানে রাত্রি-ভোজের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিয়াছেন। আহারের স্থানসকল শোভনরূপে সজ্জিত করা হইয়াছে বলিয়া, হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ, আজ আগন্তুকদিগের জন্য আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সে সব ঘর একেবারে ভরপূর দেখিয়া, আমরা খোলা বারান্দায় আসিয়া কোন প্রকারে একটু বসিবার স্থান যোগাড় করিয়া লইলাম। আমরা জানি, বিলাতের হোটেলের মত দশটা লোক তৎক্ষণাৎ আসিয়া, আমাদের আজ্ঞার অপেক্ষা করিবে। কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই দেখিলাম না। বস্ বসিয়াই আছি। এতদিন কুক্ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এ সব ঝঞ্ঝাটে কখনও পড়িতে হয় নাই।

স্থানীয় ভাষা না-জানা বিদেশে, গাইড হেন বন্ধুজন ব্যতীত যে, আমাদের অন্যগতি নাই, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম ; এবং ভবিষ্যতে আর এমন জনে কখনও বিতৃষ্ণ হইব না, মনে মনে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলাম। কেহ কাছে আসিলেই "Tea Tea" এই কথাটি বার দুই তিন বলা হয়, কিন্তু কেহই তাহা কাণেই তুলিতেছে না দেখিয়া, হাসিও পাইতেছে, বড় বিরক্তও লাগিতেছে। আমার ভ্রাতা ভাবিলেন, এ সময় দুই চার কথা শুনাইতে পারিলে, তবে মনের ঝালটা একটু মিটিত। কিন্তু সেই যে কথায় বলে, "বেঁধে মারলে সয় ভাল" তাঁর আজ সেই দশা। অসময়ে জাহাজেও এই পানীয়-লাভ দুর্ঘট হইবে জানিতেন, সুতরাং রাগের মাথায় সেখানে গিয়াও কোন লাভ নাই। ইত্যবসরে কে যেন একটু বিনীত ভাবে আসিয়া, আধা আধা ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল

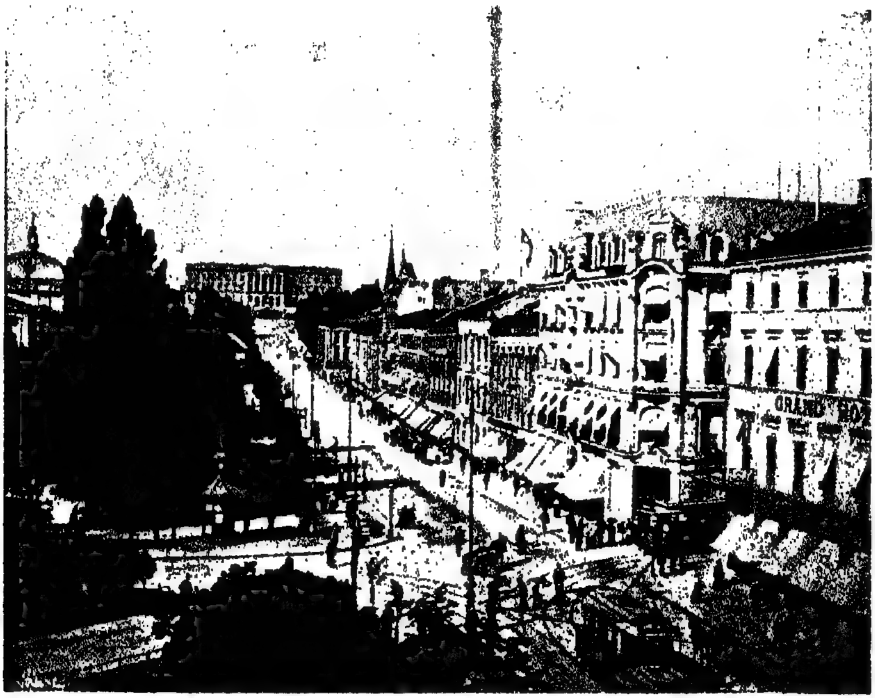

জেয়ান্স্ গেড্

"আমরা কি চাই ?" আমাদের যদি মনে থাকিত যে, এ দেশে চায়ের চলন তত নাই, কাফি আর চকলেট-পানেরই প্রথা, তবে কি আর এ আহাম্মুকী বলিতে হইত ! এখন

বুঝিলাম যে, বিনা দোষে এদের উপর অবিচার করা হইতেছিল.
পাওয়া গেল, তা আদৎ চায়ের দেশের অধিবাসিগণের গলাধঃকরণ কর। .
তাদের একটু ভাল ভাল চায়ের আস্বাদ রাখাই অভ্যাস। যাক্ সে দুঃ।
এ স্থান হইতে চিরবিদায়-গ্রহণের আগে সে বৃহৎ ভবনের চিত্রপট সকল না দে৴
আসা গেল না। নরউইজীন চিত্রকরেরা কলাবিদ্যায় পারদর্শী বটে! যেমন সুন্দর বর্ণবিন্যাস, তেমন তাদের লিখনও চমৎকার দেখিলাম। আর অভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও এখানে অভাব নাই; কাজেই এ সবের চিত্রই বেশী ছিল। মনোনিবেশপূর্ব্বক ইচ্ছামত সময়, ইহাতে অতিবাহিত করিব, আমাদের সে যো ছিল না। বংশীরব ক্রমাগত আমাদিগকে কূল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিতে আদেশ করিতেছে। এ ডাক শোনা না শোনা নিজেদের ইচ্ছাধীন নয়। এখানে বেতনভোগী হুকুমের দাসের হুকুম, না শুনিলে দণ্ডভোগ আছে। সেও আবার যে সে দণ্ড নয়, আমাদের পক্ষে প্রায় আণ্ডামানে বাস গোছ্। তখন প্রাণের দায়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এক ভরসা যে, আমরা কাল কয়জন একেবারে "Hall Mark" করা—হারাইলেই খানাতল্লাস হইবেই হইবে। সুতরাং কাপ্তেন সাহেব জানিয়া শুনিয়া নির্ম্মমের মত ফেলিয়া যাইবে না নিশ্চয়। বিশেষ এত দূরদেশ হইতে আসিয়াছি বলিয়া আমাদের প্রতি তার খাতিরও ছিল যথেষ্ট। নিয়ম ছিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত আধ ঘণ্টার বেশী কাহারও জন্য কর্ণধার অপেক্ষা করিবেন না, আমরা তার আগেই আসিয়া পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই তরী খুলিয়া দিল।

ক্রমে আবার শৈলশিখরসমন্বিত, ফিয়ডের একাধিপত্য ছাড়াইয়া, সেই অসীম অতল নীলসিন্ধুর জলে আসিয়া পড়িলাম। তখন সেই স্বচ্ছ সলিলে আপনার সসীমরূপ প্রতিফলিত দেখিয়া, যেন লজ্জা পাইয়া প্রকৃতিসুন্দরী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সীমার সুশোভন সাজ বেশ, অসীমের বিরাট মূর্ত্তির কাছে কেমন খেলো দেখায়। অনন্ত আকাশ আর অতল জলধির তুলনায় সকলি যে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর এ অভিজ্ঞতা জন্মে। তখন সকল রূপোন্মত্ততায় অবসাদ আসে। কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি চাতুর্য্যময়ী, তিনি কি আর বেশীক্ষণ অন্তরালে থাকিতে পারেন? যেই দেখিলেন যে, ভাস্কর সেই প্রশান্ত সমুদ্রবক্ষে আপনার মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া, দিগবধূগণকে আনন্দে মাতাইয়া তুলিতেছেন, অমনি কোথা হইতে অলক্ষিতে একখণ্ড মেঘ আসিয়া, সেই সমুজ্জ্বল মুখের উপর ফেলিয়া তাহা ঢাকিয়া দিলেন। আর প্রভাকরের প্রণয়িনীগণ তৎক্ষণাৎ বিরহ-ব্যথায়

..লেন; পরক্ষণেই করুণার পরবশ হইয়া সে আবরণ উন্মোচন ..লকে হাসাইলেন। আবার কি মনে করিয়া, ইঙ্গিতে সমীরণকে মৃদুমন্দে বারিধিবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ সৃষ্টি করিয়া, দিনমণির কনককান্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন ..য়া দিতে আদেশ করিলেন। প্রভঞ্জনও অচিরাৎ দেবীর আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর হইলেন। এইরূপে ক্ষণে দর্শন ক্ষণে অদর্শনে, দিঙ্মণ্ডলকে অভিভূত করিয়া দিনের পালা সাঙ্গ করিলেন। তারপর সন্ধ্যাকে টানিয়া আনিয়া, এতদিন পরে নিশারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন, কিন্তু নিশার পতি-দেবতা চুপে চুপে আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইতেই সন্ধ্যা সরমে সরিয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে দেবী তারকার মালা গাঁথিয়া বিলাসী নিশাপতির আনমিত গলদেশে অর্পণ করিয়া সকৌতুকে ঈর্ষান্বিতা বিভাবরীকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন

"নবিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে
কষায়তে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে।"

আমরা প্রকৃতি আর পুরুষের এই চির মাধুর্য্যময় প্রণয়াভিনয় দেখিতে দেখিতে, সেই এক ঘেয়ে জলে-জলাকার ভাবটা ভুলিয়া থাকিতাম।

পরদিন আমরা রাজধানী খ্রিষ্টিয়ানার সম্মুখীন হইতেই আমাদের জাহাজে Royal Flag উড়াইয়া দিল। সে দিন কাপ্তেন সাহেব আমাদিগকে জাহাজের কিছু কল-কারখানা দেখাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। কেন না বিদেশী বলিয়া আমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ যত্ন, সে কথা আগেই বলিয়াছি। তিনি চতুর্থ ডেকে একখানা ঘেরা-দেওয়া ছোট কুটরীতে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। তথায় গিয়া দেখি, এক প্রকাণ্ড কম্পাস যন্ত্রের সাহায্যে দিঙ্-নির্ণয় করিয়া, একখানা চাকা এদিক ওদিক ঘুরাইয়া, সেই বৃহৎ জলযানের প্রান্তদেশস্থিত হালকে নিয়মিত করিতেছে। যে ব্যক্তির উপর ইহার চালনার ভার, তাহার আর অন্যদিকে দৃক্‌পাত করিবার যো নাই। তবে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর নূতন লোক আসিয়া ইহাকে অব্যাহতি দেয়, এরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেখানে একখানা টেবিলের উপরে যে মানচিত্র দেখিলাম, তাহাতে জাহাজখানার গমনের পথ নির্ণীত করা আছে, এবং সে পথের দুই পাশের জলের গভীরতার পরিমাণ লেখা রহিয়াছে। তদনুসারে গতির বেগ কম বেশী করা হইতেছে। আমাদের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিতে এ সকল দুরূহ সামুদ্রিক তত্ত্ব কিছুই আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, কেবল কৌতূহলবিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। তারপর যাহা দেখাইলেন, তাহা

আরও বিস্ময়জনক। রঙ্-বেরঙের নিশান উড়াইয়া, ভিন্ন ভিন্ন জাহাজের কর্ম্মচারীদের সহিত কিরূপে রীতিমত কথাবার্ত্তা চালান যায়, তাহার নমুনাস্বরূপ একখানা মোটা পুস্তক বাহির করিলেন। তাহাতে প্রত্যেক দেশের রাজকীয় পতাকার বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও নমুনা লিখিত আছে, এবং সেই বর্ণানুসারে নাকি প্রশ্নোত্তর চলে। এই সকল হরেক রকমের চিত্র দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ "ইণ্ডিয়ার" পতাকার দিকে নজর গেল। সেই চিরপরিচিত ধ্বজ! গ্রেটব্রীটনের সঙ্গে একীভূত হইয়া আছে, কোন পার্থক্য নাই। জন্মাবধি ইহা দেখিয়া আসিয়াছি। তবু আজ কেমন চোখে একটু ধাঁধা লাগাইল! প্রত্যেক পতাকার বিভিন্ন আকার দেখিয়া সহসা এ অভিন্নতা কেমন যেন একটু খাপ্ ছাড়া বোধ হইল। আর কলকারখানা দেখার দিকে মন গেল না। এরপর যা দেখিলাম, সে কেবল বাহিরের চক্ষে। সব দেখা শেষ হইলে, নাবিক মহাশয়কে যথোচিত ধন্যবাদ দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। ততক্ষণে রাজধানী নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। দূর হইতেই দেবতার হাত ছাড়াইয়া এখানে মানুষের হাতের নিদর্শন সব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। অভ্রভেদী সৌধ-চূড়া সকল, যেন নভোমণ্ডলকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তথাকার বৃহৎ বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর করিবামাত্র, অনেক দিন পরে আবার সেই ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গাড়ীঘোড়া এবং জনতা দেখিয়া প্রাণের এতদিনকার উদার প্রফুল্ল ভাবটা যেন হারাইয়া ফেলিলাম। বাইরেও কলরব। ভিতরেও মহাগোলযোগ বাঁধিয়া গেল। আমরা যদিও রাজধানীরই লোক বটে, তবু সে রাজধানীর তুলনায় এর সবই অন্য রকম লাগিতে লাগিল। এদের রাজাও ফরসা প্রজাও ফরসা; রাজারও যে মাতৃ-ভাষা, প্রজারও সে ভাষা। এক স্থানেই দুইএর জন্ম, দুইএর একই ধর্ম্ম, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্ম, এক প্রণালীতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তারপর দেহান্তে সম্রাটের দেহের যে গতি, তাঁহার অধীন জনেরও সেই বিধি!

এ দেশের চিরন্তন প্রথানুসারে ঊষার মুখ কেহ বড় একটা দেখে না, দেখিতে পায়ও না। পাছে ঊষার নব উন্মেষিত মোহন মধুর রূপের ছটায় কেহ সজাগ হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে যেন নিদ্রাদেবী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকেন। দিবাকর নিদ্রাদেবীর এই অনধিকার চর্চ্চায় রোষান্বিত হইয়া আপনার রশ্মিজাল বিস্তারপূর্ব্বক সেই নিরাশ্রয়া মুগ্ধা বালিকাকে সস্নেহে তন্মধ্যে রক্ষা করিয়া, নিদ্রাদেবীকে অন্তর্ধান হইতে আদেশ করেন। তখন চৈতন্য লাভ করিয়া, পুরুষরমণী অভেদে দিনমানের

জন্য, সেই বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে যে যার ছুট্ দেয়। আমাদের দেশে কিন্তু এতটা ছুটাছুটি দেখি না, সব র'য়ে স'য়ে হয়। এখানে পিতা, পুত্র, ভাই, ভগিনী, স্বামী, স্ত্রী, শত্রু, মিত্র,—কে কার আগে যাবে, প্রাণপণ এই চেষ্টা—সর্ব্বত্র এক লক্ষ্য—পদবৃদ্ধি। এই পদ অনুসারেই মান-সম্মান! নইলে কেহ কাহাকেও পোছে না। এ সব স্বাধীন রাজ্যে জাতিবিচার নাই বটে, এই পদবিচারই বা কম কিসে?

আজ প্রথমেই আমাদিগকে টুরিষ্ট হোটেলে যাইয়া সে স্থান হইতে নগরটির সমগ্র দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে হইবে, আমাদের প্রতি কুক্ কোম্পানীর এই আদেশ জারী হইল; —পরে নামিয়া, লেণ্ডো গাড়ীতে চড়িয়া, কিছুদূর গিয়া নির্দ্ধারিত এক ট্রেম গাড়ীর নিকট উপস্থিত হওয়া এবং ইহারই সাহায্যে এক পাহাড়ের পাদদেশে আগমন করিয়া, পদব্রজে সে পর্ব্বতের সানুস্থিত পান্থশালায় পৌঁছান। এখানেও আমাদের সঙ্গে এক পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ জন্য পরিচয়-পত্র ছিল। গাড়োয়ানকে সে বাড়ীর কর্ত্তার আফিসের ঠিকানা বলাতে, আমাদিগকে সেখানে নিয়া উপস্থিত করিল এবং কার্ড পাঠাইবা মাত্র তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। জানি না, কি মনে করিয়া তাঁর মুখে আর হাসি ধরে না। একেবারে দুই হস্ত বাড়াইয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এবং স্বেচ্ছাক্রমে আমার ভ্রাতার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অশ্বচালককে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তাহার অমায়িক ব্যবহারে মনে হইতে লাগিল, যেন কতদিনকার পরিচয়। নরওয়েজীনদের মত আগন্তুকদের প্রতি এমন সরল স্বাভাবিক ব্যবহার সচরাচর সভ্যদেশে দেখা যায় না। কুক্ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ট্রেমের নিকটে আসিতেই আমাদের গাড়ীগুলি থামিল। আমরাও সকলে নামিয়া সেই বৈদ্যুতিক শকটের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান লাভ করিলাম। লণ্ডনে আসিবার আগে আর কখনও ট্রেমে চড়া ভাগ্যে ঘটে নাই। সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে একত্র বসিয়া সদর রাস্তায় এ ভাবে যাতায়াত, বঙ্গমহিলার পক্ষে এক অভিনব ব্যাপার বলিতেই হইবে। কাজেই প্রথম প্রথম কেমন একটু বাধো-বাধো ঠেকিত। কিন্তু এতদিন এই সব পাশ্চাত্য সভ্য দেশের সংশ্রবে সে বাধো-বাধো ভাবটা এখন বিলুপ্ত-প্রায়। মানুষ এমনি অভ্যাসের দাস! আমরা তখন দুইতিনখানা ট্রেমগাড়ী বোঝাই হইয়া চলিলাম। সব সহযাত্রী এভাবে একত্র বসিয়া যাওয়ার একটা বেশ আমোদ আছে। ক্রমে সহর ছাড়াইয়া বাইরে আসিতেই আবার পাহাড়ের পাট আরম্ভ হইল। এবারে একটি পাহাড়ের পদতলে আসিয়া আমাদের ট্রেম থামিল। নামিয়া

আমাদিগের নূতন পরিচিত বন্ধু সেই হোটেলের উদ্দেশ্যে চড়াই-পথ ধরিলেন। আমরাও তাঁর অনুগামী হইলাম।

দেখিলাম কি প্রশস্ত পাহাড়টি! কি দিব্য পরিপাটী হোটেলটি! কি চমৎকার চতুর্দ্দিকের দৃশ্যটি! একটু বিশ্রামের বাসনায় ব্যাকুল হইয়া আমরা হোটেলের বারাণ্ডায় গিয়া বসিলাম। তখন আমাদের প্রতিকৃতি তুলিবার মানসে নিকটস্থিত এক ব্যবসাদার ফটোগ্রাফার আসিয়া সম্মুখে হাজির। তার নিবেদন এই যে, এক ঘণ্টার আগেই ফটো তুলিয়া এবং ছাপাইয়া আমাদিগকে দিয়া যাইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। আমরা প্রথমে একথা বিশ্বাস করিতে চাই নাই। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখিলাম যে, না দিতে পারিলে ইহাতে লোকসান্ সে ব্যক্তিরই, তখন স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু চেষ্টা করিয়া চেহারায় ইচ্ছামত চারুতা ফলাইতে গেলেই যত সব গোল বাঁধায়। হুকুমের হাসি যেন তখন দন্তপীড়াজনিত দুঃখকেই প্রকটিত করে। দেহকে নিশ্চল রাখিতে গিয়া, নয়নযুগল চঞ্চল হইয়া পড়ে। তখন তাকে শাসনে আনিতে গেলে মস্তক বিদ্রোহ করে। সুতরাং প্রতিকৃতি তোলাইবার বিড়ম্বনা বহু। তা কে শোনে! নাছোড়বান্দা! অগত্যা কাজ হাসিল হইলে পর সে লোকটির হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া, বন্ধুবর আমাদিগকে লইয়া ঘরের ভিতর যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার দুহিতা, জামাতা ও বনিতা আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দিলেন। তখন কর্ত্তা মহাশয়, ছোট গলায় একটু গর্ববভরে আমাদিগকে বলিয়া রাখিলেন যে, তাঁহার এই কন্যা, এদেশে একজন অসামান্য রূপসীর মধ্যে পরিগণ্যা। একথা শুনিয়া আর বিশেষভাবে সে মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিয়া কি উদ্ধার আছে? কিন্তু মূলেই যে ভুল! যে ভ্রমর-কৃষ্ণ-লোল-লোচন আমাদের ধারণায় সৌন্দর্য্যের সার ভূষণ, তার পরিবর্ত্তে পিঙ্গলনয়ন হইলেই—হউক্ না সে অঙ্গনা "পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী" "মধ্যে ক্ষামা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা" "শিখরি দশনা," আমরা সেখানে রূপের সে মাহাত্ম্যই খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু কি করি, এস্থলে স্বয়ং জনকই যখন বড়াইকর্ত্তা, তখন ভদ্রতার অনুরোধে তাঁর কথাই স্বীকার করিতে হইবে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসারে এসব বিষয়ে অনৃতভাষণ, মোটেই নাকি দোষাবহ নহে বরং যথার্থ মনোগত ভাব ব্যক্ত করাই ভারি অসঙ্গত। তারপর কর্ত্তৃঠাকুরাণীর বিশাল বপু দেখিয়া আমরা একটু থমকিয়া গেলাম। দেশাচারের অনুরোধে "মধ্যে ক্ষামা" হইতে গিয়া তিনি যেন ভারি অস্বস্তি মনে করিতেছিলেন। দেখিলাম, তাঁর নিটোল কপোল যুগল, প্রসারতা লাভ করিতে গিয়া নেত্রদ্বয়কে

বিলুপ্তপ্রায় করিয়া দিবার চেষ্টায় আছে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, পক্ষ্মসকল প্রহরী রহিয়াছে। নাসিকাটি দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থের পক্ষপাতিতা জানাইতেছে। তাঁর স্থূল গ্রীবা, সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ বদনমণ্ডল সহ মস্তকের ভারবহনে অসমর্থ হইয়া, একেবারে অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে, ভাগ্যে তখন সুদৃঢ় চিবুক সে ভারসহ বক্ষস্থলে ভর করিয়া সে উত্তমাঙ্গ ধারণ করিয়াছিল! নতুবা বোধ হয় বিভ্রাটের সীমা থাকিত না। তার পরিপুষ্ট বাহুলতা যেন স্বতই আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কিছুতেই হস্তের দোহাই মানিতেছে না। আর তার নিরীহ পদদ্বয়ের কেবল বেগার খাটাই সার! হাঁ—জামাতাটি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ সুপুরুষ বটে। বিভাগটি হইয়াছিল ভাল। জননী আর জামাতা—ইংরেজীভাষায় সম্পূর্ণ অনধিগত, পিতার আর দুহিতার তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। বেশীর ভাগ আমরা কন্যাটির সঙ্গেই কথাবার্ত্তা করিয়াছিলাম। কর্ত্তা-মহাশয় বোধ হয়, শিষ্টাচারের অনুরোধে আমাদের আহারাদির অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিলেন, আমরা আজ অতিথি-জ্ঞানে তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলাম। ইত্যবসরে আমরা সেই হোটেলের মধ্যে যত কিছু দেখিবার দেখিয়া লইলাম। আহারে বসিতে গিয়া দেখি, ফলফুলে আহার স্থান সুশোভিত, আর নরওইজীনদের বিশেষ বিশেষ আহার্য্য দ্রব্যের তালিকাসহ আমাদিগের প্রত্যেকের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এখন চাই কোন দিকে? সে স্থানে বসিয়া নৈসর্গিক শোভা ত না দেখিয়া উদ্ধার নাই; প্রকৃতিসুন্দরীর একেবারে মাথার দিব্যি! এদিকে এত জন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে আর আলাপের অবসরই বা পাই কোথায়? কি করি! দোটানায় পড়িয়া কোনমতে কাজ চালাইতে লাগিলাম। আশেপাশের লোকেরা এরূপ সাদা-কালর জটলা দেখিয়া, কেমন যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, যেন কোন যন্ত্রসাহায্যে তাহাদের ভোজন-ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছিল। আহার-পাত্রে নেত্রদ্বয়কে সন্নিবেশিত রাখে, তাহাদের সাধ্য কি? আমরা কিন্তু এমন সকল ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়ায় একেবারে অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছি! বেশ খোস্ মেজাজে সময়টা কাটিয়া গেল। আহারান্তে এই হোটেলের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ একখানা মস্ত ফর্দ্দ লইয়া আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। আমরা তাহাতে দৃক্‌পাত করা উচিত মনে করিলাম না; কেন না আজ আমরা অভ্যাগত। কিন্তু আমাদের অভি-ভাবক মহাশয় যখন হিসাব দেখিয়া ইংরেজীতে তাহা তর্জ্জমা করিয়া, অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমার অগ্রজকে লক্ষ্য করিয়া কাগজখানা সেদিকে লইয়া যাইতে অনুরোধ

করিলেন, তখন দেশভেদে ভদ্রোচিত ব্যবহারের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া, আমার ভ্রাতা সস্মিতমুখে সকল পাওনা চুকাইয়া দিলেন। তখন উঠিয়া আমাদিগকে এই হোটেলের চতুর্দ্দিকে বিশেষ বিশেষ স্থান দেখিতে যাইতে হইল। একটু যাইতেই পাইন ফরেস্টের মধ্যে আসিয়া পাড়লাম। এসব নির্জ্জন স্থান মনটাকে বড় উদাস করে, এরাজ্যে থাকিতে দেয় না। গাছগুলি দাঁড়াইয়া, এখানে আরও যে কত লোক আসিয়াছিল, যেন তাদের কথা বলিতে লাগিল। এই চির-পুরাতনের সঙ্গে কেবলি নূতনের পরিচয়! আসা আর যাওয়ার মধ্যে এই দৃঢ় নিশ্চল ভাব! কিছুই ত বুঝি না। এরা ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়া কাহাকেও খুঁজিয়া মরে না! অথচ জন্মাবধি এরা এই একই স্থানে দাঁড়াইয়া, যে সন্ধান পাইয়াছে, যে সাক্ষী দিতেছে, আমরা ভবঘুরে হইয়া তা পাইয়াছি কি? তা

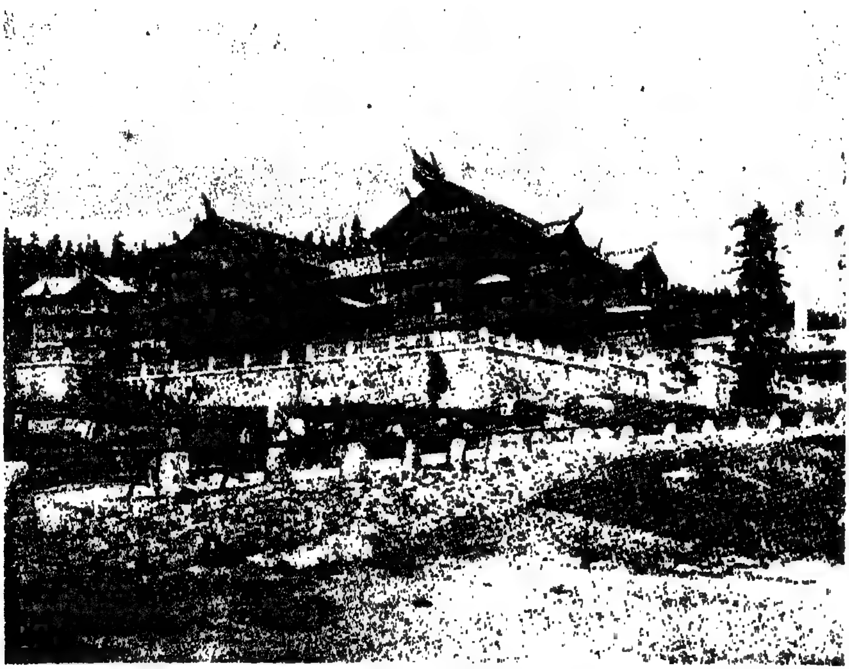

টুরিষ্ট্ হোটেল—হল্মেন্ কোলেন্

পারি কি? এদের মত কখনও কি এত উন্নত হইতে পারিব? আপনার পূর্ণবিকাশ দেখাইতে সক্ষম হইব? যা কিছু শুষ্ক, মলিন, অমনি ত এরা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

সরলতাই এদের জীবন! বিস্তৃতিই এদের ধর্ম্ম। যখন এসব ফুরাইয়া যায়, তখন আপনার ধ্বংস প্রার্থনা করে, নবীনকে স্থান দিবে বলিয়া। এ কি নিঃস্বার্থপরতা! আমাদের এসব শুধু দেখাই সার! আর ভাবাই কর্ম্ম! গ্রহণের ক্ষমতা রাখি না—উপায়ও জানি না।

দেখিতে দেখিতে এক বৃহৎ হ্রদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। কত লোক ছোট ছোট নৌকায় তাহা পার হইতেছে। সময় সংকীর্ণ জানিয়া, আমাদের মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। আমাদের নবপরিচিতা গিন্নীমাতা তখন আমাদিগকে তাঁহার বাড়ী গিয়া চা-পান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরাও সাদরে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। এ ভদ্রতাটুকু হইতে তাঁকে বঞ্চিত করা উচিত মনে করিলাম না। স্থূলাঙ্গিনীগণ স্বভাবতঃই প্রায়শঃ প্রফুল্লচিত্ত হইয়া থাকেন; পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তার অনাদিকাল হইতেই এই বিধান চলিয়া আসিয়াছে। নয় ত সৌখীন মানবচক্ষু যে কিসে কি করিয়া বসিত, বলা যায় না। হোটেল হইতে সেই প্রবীণার বাড়ী পৌঁছিতে আমাদের যেন মুহূর্ত্তমাত্র জ্ঞান হইল, তিনি আমাদের দলবলকে এমনি জমাইয়া রাখিয়াছিলেন। বাড়ীটির যেমন বাহির সুন্দর, তেমনি ভিতরটি মনোহর! কথায় কথায় জানিলাম, এটি তাঁদের নিজস্বমত বাটী এবং এ বাড়ীর মালিক এ দেশের একজন সমৃদ্ধিশালী কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী বণিক। যে পাইন ফরেষ্ট দেখিয়া আসিলাম, সে বৃক্ষের জন্য নরওয়ে বিখ্যাত। এখানকার ভাগ্যলক্ষ্মী নাকি ইহারি আশ্রয়ে বাস করেন, আর তাঁর বসতি—মৎস্য-জীবীদের গৃহে শুনিলাম। "সেমন" নামক মৎস্যে নাকি তিনি বিশেষ অনুরক্তা। মন্দ নয়! মৎস্যের যে পূতিগন্ধে, প্রেতযোনিরা পর্য্যন্ত পলায়ন করে, কমলবাসিনী হইয়া তিনি যে কেমন করিয়া সতত তাহা নাসারন্ধ্রে ধারণ করেন, আমরা ক্ষুদ্র বঙ্গবাসী, এ রহস্য কেমনে বুঝিব? বেশীক্ষণ সে গৃহে থাকা হইল না, কারণ কর্ত্তা এবং কর্ত্তৃ-ঠাকুরাণীর দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন অন্যত্র রাত্রি ভোজনের (dinner) নিমন্ত্রণ ছিল; বলিলেন, আগন্তুক ছাড়িয়া এভাবে চলিয়া যাওয়ায় অভদ্রাচরণের জন্য তাঁহারা উভয়েই বড় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। সেই বিল্ না চুকান ভিন্ন, আর তাঁহাদের অভ্যর্থনার কোনরূপ ত্রুটী পাইলাম না। দিন থাকিতেই তাঁরা রাত্রি-ভোজনের নিয়মিত বেশ পরিধান পূর্ব্বক আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণেচ্ছু হইলেন; এবং এই অসময়ে এহেন বেশ-ধারণের কারণ বিশেষ করিয়া এই বলিলেন যে, বৎসরের বেশীর ভাগ তাঁহাদিগকে রাত্রির অন্ধকার লইয়াই থাকিতে হয় বলিয়া ডিনার

ব্যাপারটা তাঁরা বিকালের মধ্যেই সারিয়া ফেলার নিয়ম করিয়াছেন। বৎসর-ভরা একই নিয়ম চলে তাতেই এই কটা মাস তাঁদের সময়োচিত পরিচ্ছদ ব্যবহার হইয়া উঠে না। অতএব যেন তাঁহারা আমাদের নিকট হাস্যাস্পদ না হন, সেজন্য আগেই ইহা বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন। আমরা কিন্তু এই সামান্য বিষয় লইয়া, এতটা করিবার কিছু আবশ্যক দেখিলাম না। সময়ভেদে আহারের পরিতৃপ্তির সঙ্গে, অঙ্গের পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তনের যে কি সম্বন্ধ তাহা ত আমরা বুঝি না। কোন কালে বুঝিব কি না কে জানে! বিদায়কালে কন্যার উপর আমাদের চা-পানের তদারকের ভার দিয়া গেলেন।

সে সুভ্রূ, তদ্দেশীয় রুচি অনুসারে মহা খাতিরজমা যে, তার মত সুলোচনার ঈপ্সিত সঙ্গ ছাড়িয়া, সহজে কেহ যাইতে চাহিবে না। কিন্তু দেশ ও কাল ভেদে যে রুচির পার্থক্য হইয়া থাকে, সে বেচারা ত আর তা জানেন না। তিনি তাঁর সুমিষ্ট গলায় দুই একটি গান করিলেন, তাঁর চিত্র-বিদ্যার বহু নিদর্শন দেখাইলেন, শিল্পকলায় যে তিনি সিদ্ধহস্তা, তাহার প্রমাণ সকল আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। প্রকৃতই মেয়েটি যে সর্ব্বগুণসমন্বিতা, তাহা বলিতেই হইবে। ইংরাজীতে যাকে বলে "Accomplished"—তাই। এ সকল চাড়াও তাঁর চরিত্রগত একটা সহজসুন্দর বৈচিত্র্য ছিল, যাতে আমাদের সকল ভেদবিচার ভুলাইয়া দিল। খুসী মনে তাঁকে ছাড়িয়া যাইতে আর পারিলাম কৈ? তাঁহার স্বহস্তে মিশ্রিত, অতি উপাদেয় কফি পান করিয়া, আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। যাত্রার সময় আগত জানিয়া গাত্রোত্থান করিবামাত্র আমাদিগকে আর কিছুক্ষণ বসিতে অনুরোধ করিলেন। কোনদিন জর্ম্মানিতে গিয়া তাঁহার আপন আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার স্বামীও শিরঃকম্পনে তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া, আমাদিগকে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাঁহাদিগের যুগল শিষ্টাচারে বলিতে কি, আমরা যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম, আর ভাবিলাম, এত যারা খাতির জানে, তাদের সেই বিল হেন ব্যাপারে অতটুকু গলদ রাখার তাৎপর্য্যটা কি হইতে পারে? অথবা "অল্পস্য হেতোঃ বহু হাতুম্" ইচ্ছায়, বিচারমূঢ়তা মাত্র প্রকাশ পায়। যাক্ তারপর ধন্যবাদাদি শিষ্টাচার-বিধি পালন করিয়া, সময়ের স্বল্পতা জ্ঞাপনান্তর, সহযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিয়া, নির্দ্দিষ্ট ট্রেনের নিকট দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সকলে সমবেত হইলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সেই দম্পতি গবাক্ষ-দ্বার হইতে রুমাল উড়াইয়া, আমাদিগের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং আমরা অদৃশ্য হইবার আগে তাহা হইতে বিরত হইলেন না।

রাজধানীতে আরও দুইদিন থাকিবার কথা। পরদিন এক অতি প্রাচীন গির্জ্জা পরিদর্শন। এখানকার অধিবাসিগণের মতে ইহাই নাকি সর্ব্বপ্রথম ভজনালয়; শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্য যেন আর তর সয় না। মনের আগ্রহ দেখিলে, সময়ও দীর্ঘ হইয়া বসে, বড় সহজে নড়িতে চায় না।

কিন্তু ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাকে উপরওয়ালার হুকুম মানিয়া নড়িতেই হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্বযান সকল আসিয়া হাজির, আমরাও চড়িয়া বসিলাম। গাড়ী আজ আমাদিগকে সহর দেখাইয়া চলিল। অনেক স্কুল, কলেজ, যাদুঘর, চিত্রাগারের পাশ দিয়া গেলাম। কৈ, যা দেখিতে আসিলাম, তার ত কোনই চিহ্ন দেখিতে পাই না।

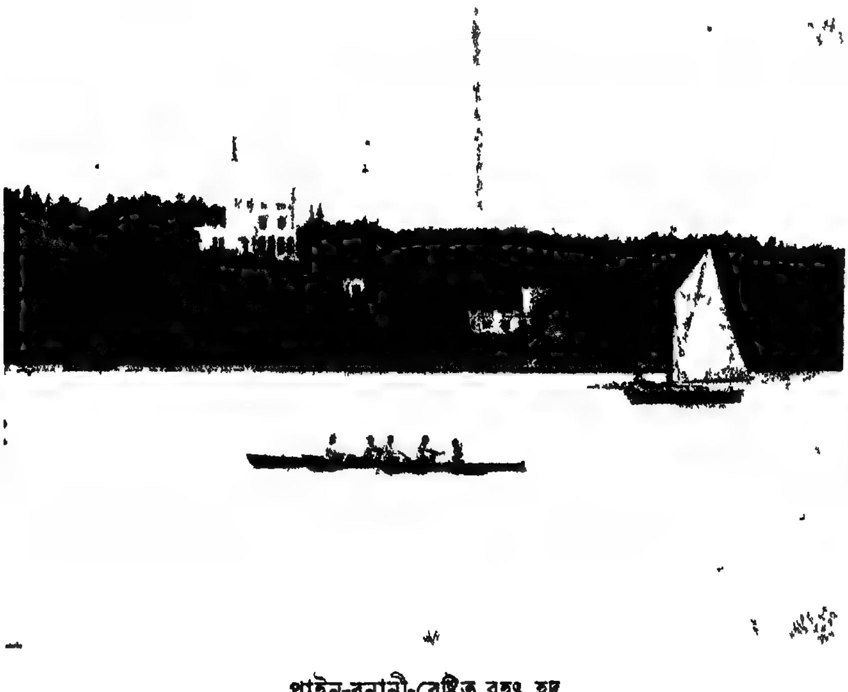

পাইন্-বনানী-বেষ্টিত বৃহৎ হ্রদ

এই বলিতে ছোট্ট একটি পাহাড়ের গায়ে একটি কাল চূড়া দেখা গেল, বুঝিলাম এই তবে সেই হবে। বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, দুর্নিবার কাল, বসিয়া বসিয়া ইহাতে

এই কালের রঙ ধরাইয়াছে। বস্তুতঃই তবে উহা প্রাচীন। কিন্তু সে স্থানে পৌঁছিয়া যা দেখিলাম, তাতে উহা প্রাচীন কীর্ত্তির উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল না। আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তি সকলের মধ্যে, কত শত কারুকার্য্য আজও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে! কৈ! কালের ধ্বংসকুশলী হস্ত ত দুই চার হাজার বৎসরেও তাহা পুঁছিয়া ফেলিতে পারে নাই! সে সকল এম্‌নি পাকা হাতের কারিগরি! আর একি! একখানা কাঠের তৈয়ারি খেলাঘর! না আছে তার কোন নৈপুণ্য, না আছে তাতে বৈচিত্র্য!

যদি বল, শুধু কালের মাহাত্ম্যই কি কম? তা নয়। কিন্তু যদি সে মাহাত্ম্য কেবল অনুমান-সাক্ষেপ হয়! তবে? ধন্য পাশ্চাত্য জাতি! যে কোন তত্ত্ব প্রাচীন বলিয়া একবার কাণে গেলেই তাহারা তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়ে। তার প্রমাণ-স্বরূপ আমাদের চক্ষে এই নগণ্য গৃহটির, কেহ কেমেরা লইয়া কেহ বা Sketch book বাহির করিয়া তুলিকা সহযোগে প্রতিকৃতি তুলিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমরা তখন কুক্ কোম্পানীর উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার আশ্রয়ে কিছু কটু কথা ব্যয় করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আর রাজধানী ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু পরাধীন জনের ত আত্ম-ইচ্ছায় কার্য্য করা চলে না! সে দিন ম্লান মুখে ঘরে ফিরিলাম, কেন না আজকার কেবল যাতায়াতের পরিশ্রমই সার হইল। কাল নাকি বড় বড় Museum আর Art Gallery দেখান হইবে। ইচ্ছা ছিল না যে যাই, কিন্তু পাছে বাঙ্গালী নারী জাতির "অবলা" নামের সার্থকতা প্রমাণীকৃত হয়, সেই লজ্জার খাতিরেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সহযাত্রিগণের সঙ্গ লইতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমেই এক প্রকাণ্ড যাদুঘরে প্রবেশ করিতে হইল। সেখানে মোটেই মন বসিল না। গাইড্ মহোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ ভিন্ন শরীরের অন্য কোন কার্য্য ছিল না। চোখের দৃষ্টি ত কোন্ রাজ্যে যে অপসারিত হইয়াছিল তা নিজেই জানি না। বিদেশী বেচারা তাহা দেখিয়া, তার ভাঙ্গা ইংরেজীকে একটু ঘোরান-গোছ করিয়া, একটু বড় গলায় বক্তৃতা করিতে কৃতসংকল্প হইল, কিন্তু কর্ণ তাতে আদপে আমল দিল না। তারপর "আর্ট গেলেরীতে গিয়া আর বেশী কি দেখিব! লণ্ডনে ত আর্টের চূড়ান্ত দেখা হইয়াছে," মনে এই অবসাদ আসিল। কিন্তু যখন আসিয়াছি, তখন দেখাই যাউক, এই বলিয়া একটু অলসগমনে চলিলাম। দূর হইতে যেই মর্ম্মরপ্রস্তরমূর্ত্তি সকলে নয়ন নিপতিত হইয়াছে, অমনি চরণদ্বয় চঞ্চল হইয়া উঠিল,

আচম্বিতে দৃষ্টিকে চোখের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত পাইলাম। প্রাণমন তৃপ্ত হইল। কাছে গিয়া যত অগ্রসর হইতেছি, ততই নগ্নমূর্ত্তি সকল দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল—

"তুমি চির-বাক্যহীনা তব মহাবাণী!
পাষাণে আবদ্ধ ওগো সুন্দরী পাষাণী॥"

দুই একটি নয়, শত শত মূর্ত্তি! যেন অফুরন্ত! এখানে সবই সুন্দর—যেন সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়াছে। পুরুষ আকৃতি যেন রমণীর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"ওগো

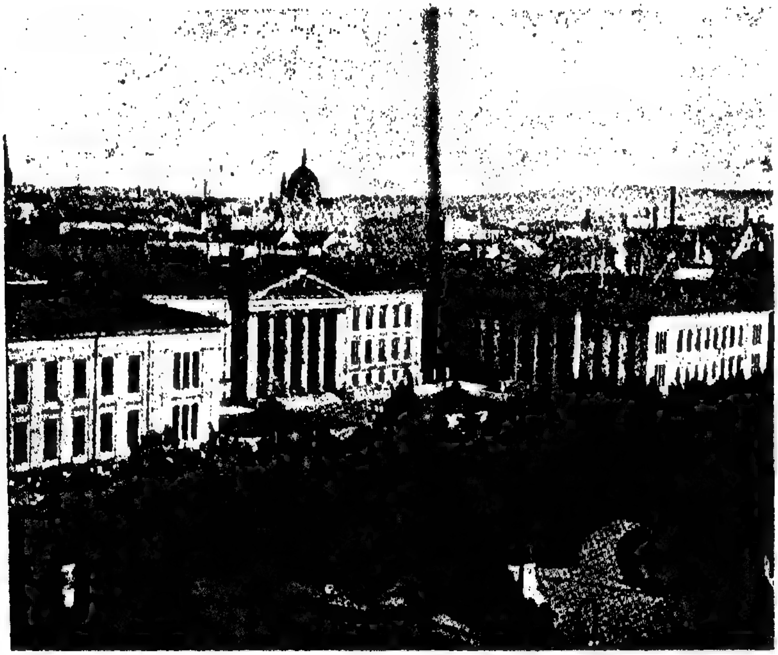

ইউনিভার্সিটি

রূপসি! কি তুমি রূপের বড়াই কর? চাহিয়া দেখ আমার দিকে, নয়ন ফিরাইতে পারিবে না।" আর রমণী অমনি উত্তর করিতেছে "কঠিন তোমরা—পাষাণ তোমরা! কি বুঝিবে তনুর তনিমা! দেখ দেখ এই পাষাণ ভেদ করিয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্যচ্ছটা কেমন উছলিয়া পড়িতেছে? অথবা তোমরা যে চক্ষুহীন! বুঝিবেই বা কেমন করিয়া?" আমরা সৌন্দর্য্যের স্বরূপ জানি না, কাজেই যাচাই করিয়া, এ বিবাদের

মীমাংসা করিতে পারিলাম না। কেবল দেখিলাম, স্থানে স্থানে সেই বিশ্বশিল্পীর দুই একটি ক্ষণজন্মা পুরুষ, নির্নিমেষ নেত্রে এই রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন। চক্ষে পলক নাই, সম্পূর্ণ আত্মহারা! তাঁহারা যেন এই জড় চক্ষুতেও দৃষ্টি দেখিতে পাইয়াছেন, সে মুখের চির-নিস্তব্ধতার মধ্যেও বিলাস-বিভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সে অঙ্গের স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন, তাই এই শিল্প দ্রব্য দেখিতে দেখিতে যেন "ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য" তাদের এই তন্ময় ভাব উপস্থিত! ধন্য তাঁহারা—যাঁহারা সৌন্দর্য্যকে এভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন!

তারপর চিত্রফলক সকলের মধ্যে পড়িয়া যেন হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। কি বর্ণবিন্যাস? কি বৈচিত্র্য? একটি ঘরে ঢুকিতেই মনে হইল, কে যেন দূরে দাঁড়াইয়া আমাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে। একটু থম্‌কিয়া গাইড বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কে?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন "এটি দেয়ালের গায়ে আঁকা একটি ছবি!" প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। পরে কাছে গিয়া সেই কেন্‌ভাসে হাত বুলাইয়া দেখি, প্রকৃতই তুলির লিখা! সে চিত্রটি বিশেষভাবে মনোমধ্যে অঙ্কিত রহিয়াছে—পুঁছিয়া ফেলিবার জো নাই। আজ সময় কাটিতেছে, বড় প্রফুল্ল মনে। এবারে এ স্থান পরিত্যাগের তাগাদা আসিল, কেননা আর একটি ভজনালয় অদ্যকার দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকার অন্তর্গত রহিয়াছে। কুক কোম্পানী যে অত বড় ধার্ম্মিক লোক, আগে তার পরিচয় বড় পাই নাই।

গাড়ীতে যাইবার সময় বড় রাজপথের ধারে এক ভজনালয় অবস্থিত দেখা গেল। এক এক খানা করিয়া গাড়ী সেই মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া থামিতেছে, আর সেই মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মান দিব্যদেহধারী এক পাদরী সাহেব সসম্মানে সকলকে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতেছেন। আমরা চলি যেন একেবারে রাজার হালে,—আমাদের সঙ্গে সারবাঁধা গাড়ী চলে। যেখানে গিয়াই দাঁড়াই, সেখানেই একটা রব পড়িয়া যায়। আজ কোন বিশেষ কাজে আট্‌কা পড়াতে দাদা আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই; তাই আমরা দুইটি বঙ্গীয় মহিলা কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে-ছিলাম। সেটা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ দোষ। সভ্য দেশের হাওয়াও তা উড়াইয়া দিতে পারে নাই—কি করা যায়! আমাদের এই সঙ্কোচভাব দেখিয়া, সেই ধার্ম্মিক-প্রবর আমাদের মুরুব্বি হইয়া, বিশেষভাবে সকল দেখাইতে লাগিলেন। আর একটি পথপ্রদর্শকও আসিয়া জুটিল। দেখিলাম, যীশুর দ্বাদশ শিষ্য দুই পার্শ্বে অবনত-মস্তকে

দণ্ডায়মান,—নিপুণ হস্তের শিল্প বটে! মধ্যস্থলে যজমানের সুবর্ণ-সিংহাসন স্থাপিত, এবং তাহার বামে দক্ষিণে কনকস্তম্ভে দীপ জ্বলিতেছে। সম্মুখভাগে উপদেষ্টার মঞ্চ মহার্হ কাষ্ঠে নির্ম্মিত ;—মনে হইল, যেন আমাদের প্রাচীন নবাবী আমলের কোন খাসমহলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চারিদিকের চাক্‌চিক্যে চক্ষু যেন ঝল্‌সিয়া গেল। ভাবিলাম, এক দরিদ্র রাখালের পূজার জন্য এত বাহ্য আড়ম্বর কেন? তবে কি আড়ম্বরপ্রিয়তা মনুষ্যজাতিমাত্রেরই মজ্জাগত হইয়া আছে? পূজার প্রকরণভেদে, প্রাণের ভক্তিশ্রদ্ধার তারতম্য ঘটে কি? এত সব আস্‌বাব্‌ সত্যসত্যই কি ধর্ম্মভাব-উদ্দীপক? যাক্—আমরা আগন্তুক, আমাদের এ অনধিকার চর্চ্চার আবশ্যক কি?

আমরা জানিতাম যে, আমাদের দেশের অশিক্ষিত পাণ্ডার দলই কুসংস্কারবশতঃ অধিকাংশ সময়ে তীর্থ-যাত্রীদিগের দ্বারা জবরদস্তি দানকার্য্য করাইয়া তীর্থ-গমনের ভবিষ্যৎ পুণ্য-সঞ্চয়ের সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি হইলেও, গৌণভাবে সৎসংকল্পে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু এই সকল সুসভ্য সাহেব পাণ্ডাদের পাকে-প্রকারে দর্শকমণ্ডলীর পকেট খালি করিবার তাৎপর্য্যটা এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত ছিল কি না, ঠিক বোঝা গেল না। এইবারে কুক কোম্পানীকে করযোড়ে বলিতে ইচ্ছা হইল, "আর কেন ভাই! ঢের হয়েছে—এখন আমাদিগকে বাড়ীর দিকে ফিরাও।" এই যে এতদিন প্রকৃতি দেবীর পিছে পিছে ঘুরিলাম, ইহাতে শ্রান্তি বোধ দূরে থাকুক, চিত্ত যেন নিত্য নব নব ভাবে বিভোর হইয়া পড়িত—অন্তরের আনন্দ, অঙ্গের অবসাদকে একেবারে উড়াইয়া দিত। আর আজ দেখ না! পা আর চলিতে চায় না, বড় ক্লান্ত—বড় শ্রান্ত।

সেদিন আমাদের জলনিবাসে নিরূপিত সময়ে পৌঁছিয়াই সটান কেবিনে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আহা! যেন মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া, বড় আরামে—বড় নিশ্চিন্ত মনে। আর ভাবিলাম—"কেগো তুমি কাছে থাক সর্ব্বদা আমার? সকলকে ছাড়িয়া এত দূর দেশে আসিয়াছি, তুমি তবুও সঙ্গ ছাড় নাই?"—এত স্নেহ কার?—বুঝিলাম না, ঘুমাইয়া পড়িলাম। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখি, শরীর মন আবার তাজা হইয়া উঠিয়াছে। মা গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়াছেন। সে স্পর্শ যে সর্ব্বক্লান্তিহর।

পরদিন প্রাতে প্রাতরাশের পূর্ব্বেই গিয়া বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া আসিলাম, সেদিন কোথায় যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, "Isle of Markuiতে গিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে দেখা।" তারা নাকি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে ধরণের

পোষাক পরিত, এখনও ঠিক সেই মতই পরিয়া থাকে,—কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তখন এত বড় একটা রাজধানীর বাহার ছাড়িয়া ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের দিকে মনটা যেন ঝুঁকিয়া পড়িল। যেন আর তর সয় না। কিন্তু সে জায়গায় উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা বড় সোজা নয়। প্রথমে কতকদূর একটা গ্রামের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিলাম; অনেক গলিঘুঁজি বলিয়া সেখান দিয়া গাড়ী চলে না। তা বেশ! অনেক দিন পরে গ্রাম্য-শোভা মন্দ লাগে নাই। পল্লীবাসীরা সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত ছিল, আমাদের এত লোকের পায়ের শব্দ শুনিয়া, যে যার কাজ ফেলিয়া, ঘরের বাহিরে আসিয়া, দাঁড়াইতেই এই অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব কয়েকটির প্রতি তাহারা এমন ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যেন "শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা।" কয়েকজন ত আমাদের সঙ্গই নিল,—কি জানি যদি আর এমন দ্বিপদ

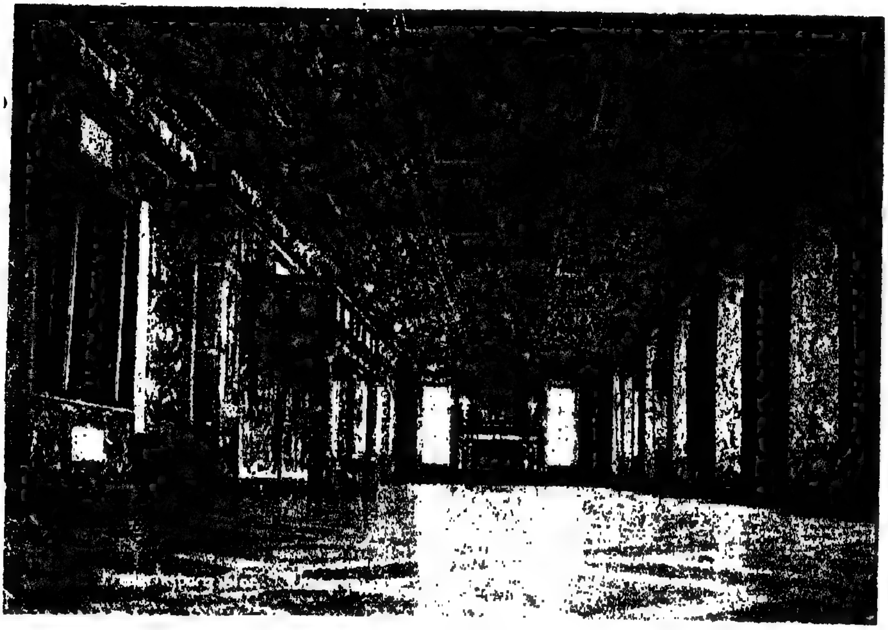

"ফ্রেডরিকস্‌বর্গ স্লট"—রিডসালেন্‌

জন্তু এজন্মে না দেখে! আমরা কিন্তু এদের দিকে তত নজর করিয়া দেখিতে পারি নাই। বাপরে! কলিকাতার বড়বাজারের গলি এর কাছে লাগে কোথায়? এত

দুস্তর রাস্তা জানিলে কি আর দ্বীপদর্শনে আসি! বাসীন্দারা কেমন খোস্‌মেজাজে চলিয়াছে! দেখিয়া হিংসা হইল। মনে ভাবিলাম, বিধাতাপুরুষ যদি অন্ততঃ দণ্ড দুইএর জন্যেও এদের মত আমাদের ঘ্রাণ এবং দৃষ্টি শক্তিকে একটু মন্দীভূত করিয়া দিতেন, তবে এযাত্রা বাঁচিয়া যাইতাম! কিন্তু যা হইবার নয়, তা ভাবিয়া ফল কি?

এই ভাবে যথাস্থানে আসিয়া খেয়া-ঘাটে ছোট ছোট Tender বাঁধা আছে দেখিলাম। ওপারে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা যাইতেছে, সেইটিই আমাদের গন্তব্য স্থান। শুনিলাম, সেখানে শুধু সহস্রাধিক ধীবরের বাস। অন্য আর কোন জাতির বসতি আর নাই। একটু অগ্রসর হইতেই মৎস্যজীবীদের নৌকার মাস্তুল সকল দেখা যাইতে লাগিল। আমরাও উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই স্থলখণ্ডে পৌঁছিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু জলপথের দূরত্ব নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। জলতত্ত্ববিদ্ ভিন্ন ইহা সহজ লোকের চক্ষুকে সততই বিড়ম্বিত করে। ক্রমে মাস্তুল সহ তরীসকলের সন্ধান মিলিল। তাহার পর মানবদেহসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর কুলে আসিয়া আমাদের জলযান ভিড়িল। তীরে শিশুর দল মহা কলরব উপস্থিত করিল। সঙ্গে দুইচার জন নবীনা চকিত নেত্রে আমাদিগকে সাদরসম্ভাষণ জানাইয়া, তাহাদের চিরন্তন ব্যবসার কিছু মুনফা করিবার আশায় আমাদিগের হস্তে বহুবিধ পোষ্টকার্ড চাপাইয়া দিল। দুই একজন আবার দুচার কথা ইংরেজীও বলিতে লাগিল; তা শুনিয়া আমরাও কিছু উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু এদের এ বিদেশী ভাষার বিদ্যাটা বেশী দূর গড়াইল না দেখিয়া, বাধ্য হইয়া, বাগ্‌দেবীকে বিদায় দিলাম।

এ দ্বীপবাসীরা সকলেই খর্ব্বাকৃতি ও কৃশকায় এবং তাহারা যে ধরণে পোষাক করিয়াছে, তাহা দেখিলে কোন মতেই হাস্য সম্বরণ করা যায় না। আমাদের দেশের নাচের কাঠের পুতুলের কথা মনে পড়িয়া গেল। মেয়েদের গড়ন যেন অবিকল সেই ছাঁচের, কেবল পরণের ঘাগ্‌রার ঘেরটা তদপেক্ষা চতুর্গুণ। পুরুষদের পরিচ্ছদ অনেকটা কাবুলিওয়ালাদের মত, কেবল মাথায় পাগড়ীর বদলে কাল চতুষ্কোণ টুপী। ইহাদের সকলেরই পদদ্বয়ে কাষ্ঠনির্ম্মিত পাদুকা, নচেৎ চলাফেরা চলে না; কেন না বৎসরের বেশীর ভাগই এই স্থলভূমিটুকুতে বারিধারা বর্ষিত হয়, বাকি সময়, রাস্তাঘাট বরফে ঢাকা থাকে। বস্তুতঃ, এমন জায়গায়ও কি মানুষ সাধ করিয়া বাস করিতে আসে? পর্য্যটকের পক্ষে এ দৃশ্য সাময়িক আনন্দদায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু আজীবন এ কষ্টভোগের কি রহস্য থাকিতে পারে, সহসা বুঝিতে পারিলাম না।

আমরা পোষ্টকার্ড নির্ব্বাচন করিতে করিতে, পথ চলিতে লাগিলাম। তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান প্রবীণপ্রবীণারা, অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা আমাদিগকে তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সঙ্কেত করিতেছিল। আদত কথা শুনিলাম,—এখানে যাহার ঘরেই যাও, কিছু নজর দিয়া আসিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এখন কাকে ছাড়িয়া কার মন রাখি, এই এক মহা সমস্যা হইল। হঠাৎ কি মনে করিয়া, আমরা আর সকলকে বঞ্চিত করিয়া এক অশীতি-বর্ষীয়া বৃদ্ধার আহ্বানমত তাহার ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। আর তার আনন্দ দেখে কে? আমাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনার নিমিত্ত সে যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে কৌতূহলপরবশ হইয়া, সে কুটীরের সকলেই আসিয়া, আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিয়া মনে হইল, যেন কতকগুলি কৃত্রিম পুত্তলীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

ঘরের দ্রব্যসামগ্রী সুশৃঙ্খলা মত সাজানো রহিয়াছে। প্রথমে তাহাদিগের পরিধেয় পরিচ্ছদ সকলের নমুনা দেখাইবার নিমিত্ত আমাদিগকে একটি টেবিলের পাশে লইয়া গেল এবং ত সমুদায়ই যে তাহাদিগের স্বহস্তকৃত, তাহাও বলিয়া দিল।

চারিদিকে চাহিয়া একটি বই দুইটি কুঠারী দেখা গেল না; তাও আবার এত সংকীর্ণ যে আমাদিগের বঙ্গীয় দেহের স্বাভাবিক পরিসর লইয়া, দুচারটি প্রাণীর স্বচ্ছন্দে ইহাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, কোন মতেই সম্ভবপর নহে। এক কোণে আবার রন্ধনসম্পর্কীয় যাবতীয় সামগ্রী মজুত আছে। ইহাদিগের আহার্য্য বস্তুর পাক-প্রণালী এত অল্প সময়-সাপেক্ষ, যে আমরা দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই তাহাদের মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন সমাপ্ত হইয়া গেল! একটি লোহার ষ্টোভে, উপর্য্যুপরি তিন চারিটি পাকস্থালীতে সজ্জী ও মৎস্যাদি মসলা-সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এই একমাত্র ব্যঞ্জন ও রুটিই ইহাদের নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্য। সান্ধ্য-ভোজনে নাকি ইহার কিছু পার্থক্য হইয়া থাকে। ইহারা বড় মাংসাশী নহে। মোট কথা, ঐ জিনিষটা এই জলসমাকীর্ণ ক্ষুদ্র স্থানে সংগ্রহ করাই যায় না! তাহার পর সেই কোণেই মেজেতে একটি খোঁড়া গর্ত্তের ভিতরে ছোট একটি বাল্‌তি ফেলিয়া, তাহা টানিয়া তুলিয়া, তাহারা জলের জোগাড় করিল। আমরা ইহাদের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এই ক্ষিপ্র কার্য্যকুশলতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। এ সমুদায় বন্দোবস্ত থাকিবার কারণ এই, এ জায়গায় বৃষ্টি এত বেশী হয়, যে ঘরের বাহিরে বড় কেহ যাইতে পারে না; তা ছাড়া শীতাধিক্যত আছেই। তারপর দেখা গেল যে, আহারের স্থান ও বিশ্রাম উপভোগের ব্যবস্থা সংকীর্ণভাবে সকলই রহিয়াছে; তবে

সবই যেন শিশুদের খেলার উপযোগী উপকরণ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। আচ্ছা! এ সব ত বেশ দেখা গেল, কিন্তু শয়নের সরঞ্জামের ত কোনই সন্ধান পাইতেছি না! ভাবিলাম, অবশ্যই স্বতন্ত্র কামরা আছে। কিন্তু এ হেন কল্পনার আশ্রয়ে আমাদিগকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না। সেই স্থবিরা স্মিতমুখে, একখানি পত্রপুষ্পপরিশোভিত পরদা, দেয়ালের গাত্র হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক এক অভিনব দৃশ্য দেখাইলেন। বস্তুতঃ এ দৃশ্য এ জন্মে আর দেখিব বলিয়া মনে হয় না। ইহাকে শয়নাগার না বলিয়া শয্যা-বিভ্রাট বলাই বেশী সঙ্গত হইবে, বোধ হয়। একটি প্রাচীরসংলগ্ন আলমারীর থাকে থাকে চারিটি প্রাণীর শয্যা পাতা রহিয়াছে, এবং দর্শকবৃন্দের বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার জন্য, ইহার প্রত্যেকটিতে এক একটি শিশু শোওয়াইয়া রাখা হইয়াছে। কোথাও একটি ছিদ্রও নাই যে, তাহা দ্বারা বাহিরের নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করিয়া, অভ্যন্তরের দূষিত বায়ুকে বহির্গত করিয়া দিবে। বলা বাহুল্য যে, সেই লোচনগ্রাহিণী নিদ্রাদেবীর এস্থলে দয়ার এই অযাচিত পক্ষপাতিতা দেখিয়া, আমরা কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলাম। আমাদের এত সাধ্যসাধনায়ও তাঁর মন পাওয়া যায় না কেন? আমরা 'নিশিভোর' দ্বার বিমুক্ত রাখিয়া একান্তে তাঁর নিঃশব্দ পদসঞ্চার প্রতীক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু তিনি অনেক সময়ই তাহা উপেক্ষা করিয়া, অকারণ আমাদের দেহমনের নিপীড়ন করিতে ছাড়েন না! আর এরা এই প্রকৃষ্টরূপে আবদ্ধ একটি ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠে, গাত্র ঢালিবামাত্রই তিনি যে নেত্র জুড়িয়া বসিয়া, পরম মিত্রবৎ আচরণ করেন! -ইহাকে পক্ষপাতিতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে বল?

এই অবস্থা দেখিতেই আমাদের প্রাণ-বায়ু যেন রুদ্ধ হইয়া আছে, অথচ এদের তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। জানি, জন্মাবধি এভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, আমাদেরও ইহা অভ্যস্ত হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের দৃশ্য-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে, তত্রনিবাসীদিগের আচরণপদ্ধতির পার্থক্য দেখিয়া, ক্ষুদ্র প্রাণও যে কি পরিমাণে প্রসারতা লাভ করে, ভাবিলে আশ্চর্য্যবোধ হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার নব নব সৃজনী-শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, অন্তরে যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয়, ইহাই দেশ-পর্য্যটনের স্থায়ী ফল মনে করি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আনমনে আরও দুই চারিটি কুটীরের ভিতর-বাহির প্রদক্ষিণ করিতেছি, এমন সময় তত্ত্বাবধায়ক স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, আমরা এ স্থানের সাময়িক পরিদর্শক মাত্র;—আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনে তৎপর হইলাম। তখন কুটীরবাসীদিগের

করুণ দৃষ্টি আমাদের কাণে কাণে যেন কি কথা কহিতেছিল, প্রথমে তাহা কিছুই বোধগম্য হয় নাই। তাহার পরেই মনে হইল, ইহাদের এহেন শিষ্টাচারের বিশিষ্ট পুরস্কার পাওয়া চাই ত! একথা আমাদের বেমালুম বিস্মৃত হওয়া ন্যায়সঙ্গত হয় নাই বুঝিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইলাম, এবং আমাদের ইঙ্গিত-মত তৎক্ষণাৎ প্রসারিত দুই চারিটি দক্ষিণ হস্তে কুক্ কোম্পানী হইতে গৃহীত কয়েক খণ্ড তদ্দেশীয় রজতমুদ্রা দান করিয়া, অবিলম্বে বিদায় গ্রহণ করিলাম। খেয়াঘাটে আসিয়া দেখি, যেন চূড়ামণি-যোগ উপস্থিত। তবে এ সেই পূত-সলিলা পুণ্য-প্রবাহিণী জাহ্নবী নয় যে শৈত্যের প্রকোপ উপেক্ষা করিয়া, প্রাণের আবেগে ইহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, দেহমনের মলিনতা বিধৌত করিয়া লইবে। সামান্য সরিৎসমুদ্রকে ধর্ম্মসংক্রান্ত করিয়া লইতে, এদেশের লোকের প্রবৃত্তি হয় না। শুনিলাম, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, নাকি এরা অকারণ স্নানাদিতে সময় নষ্ট করে না! পূজা-পার্ব্বণের তাড়াও নাই যে, অন্ততঃ পক্ষে বৎসরান্তে দুই চার দিন, ধর্ম্মের খাতিরে দেহকে জলস্পর্শ করাইতে হইবে। প্রত্যহ এই কাপড় কাচায়, আর গা মাজায় কি আমাদের কম সময়টা যায়? এসব বালাই এদের নাই!

এবার অন্য পথে গিয়া ওপারে ফিরিলাম। কিন্তু কেমন স্থানে যে ফিরিলাম, তাহা আর কহতব্য নয়। এতদিন কেবল সুশ্রীকতার মধ্যে বাস করিয়া, এইটি বড় বদ্ অভ্যাস হইয়াছে যে, বিশ্রী কিছুই যেন বরদাস্ত হইতে চায় না। এ কি বিষম বিড়ম্বনা! আমাদের দেশে কি সবই শোভন? সকলই নয়ন-রঞ্জন? তবে?—এই "তবের" ভিতর একটু তাৎপর্য্য আছে। বলিতে কি, এই ভুবনমোহন দেশে যে, এহেন কদর্য্য স্থানও আছে, আমাদের কল্পনার সীমানার মধ্যেও তা আসে নাই। আর এমন স্থান থাকিলেই বা বিদেশী দর্শকবৃন্দকে তাহা দেখাইতে হইবে, এমনই বা কি কথা? কাজেই কুক্-বাহাদুরের আমাদিগকে এই অপথে লইয়া আসিবার আবশ্যকতা বোধগম্য না হওয়ায়, সকলেরই মুখমণ্ডলে বিরক্তির রেখা দেখা দিল। বিধিকৃতে এমন সময় এতৎস্থলে একটি অমলধবল দিব্যধামের দর্শন পাওয়ায়, চকিতে সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। এই ভবনটির ভিতরে অবশ্যই ভোজনের আয়োজন আছে, ইহা অনুমান মাত্রই, সর্ব্ব উগ্রভাব অতিক্রম করিয়া উৎফুল্লতা আসিয়া সকলকে প্রফুল্ল করিয়া দিল। এও কি কখন সম্ভব যে, এত বড় কুক কোম্পানী, একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া, এত লোকের সংরক্ষণের ভার লইয়া স্থানটি মন্দ বলিয়া, সকলকে উপবাসী রাখিয়া দিবে? তারপর

মন্দ স্থানই বা বলা কেন ? মৎস্যজীবীদের জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা দেখিতে আসিয়াছ, এস্থান যে পদ্মগন্ধপরিপূর্ণ হইতে পারে না, সে ত জানা কথাই ছিল। যেখানে হাজার হাজার মৎস্যের কারবার, এবং এদেশের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পসার, সেইটি না দেখিয়া যাওয়াই কি বড় সঙ্গত হইতে ? না হয়, যে-সে জায়গায় আহার-কার্য্য সমাধান, সকলের রুচিকর হয় না। তা নাই বা হ'ল ! এক বেলার অনাহারে কেহ কি কখনও মারা পড়ে ? বিশেষ বঙ্গবাসিগণ ? তাহাদের কয়জনেরই বা পেটে দুবেলা অন্ন জোটে ! আমাদিগের সে স্থান হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে, সে হোটেলের ম্যানেজার মহাশয় একখানি পুস্তক হস্তে উপস্থিত হইয়া, আমাদিগকে তাহাতে স্ব স্ব নাম-ধাম সই করিতে অনুরোধ করিলেন। আমাদিগের লিখিত "Calcutta" শব্দটি নজরে পড়িবা মাত্র সে ব্যক্তি

ফ্রেডরিক্‌স্‌বর্গস্ট্—বাড্‌ষ্টুয়েল্

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ব্যক্ত করিতে চাহিল যে, তাহার এক পুত্র তথায় কি এক ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, আমরা দেশে ফিরিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক যেন সন্ধান করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সে তৎক্ষণাৎ সন্তানের ঠিকানা সহ একখণ্ড কাগজ আমাদিগের হস্তে প্রদান করিল। পুত্রস্নেহের এ হেন অভিব্যক্তি দেখিয়া, বস্তুতঃই সে সময়ে অভিভূত

হইয়া, সেই সরল পিতৃপ্রাণের অনুরোধ-রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া, নিজের কাছে বড়ই অপরাধী আছি।

আমাদের আজকার যাত্রার Romanceএর এখনও ইতি হয় নাই জানিয়া মা দুর্গতিনাশিনীকে স্মরণ করিয়া, আবার যাত্রা করিলাম। এবার জলপথে, ছোট এক নালার মধ্য দিয়া, নৌকাযোগে গমন। কিন্তু তত্রস্থিত তরণী সকলের আকৃতি দেখিয়া, তাহাতে আরোহণ করিতে চিত্তে তেমন প্রলোভন জন্মিল না। তবে কদাকারেও অদ্ভুত কার্য্যদক্ষতা থাকিতে পারে, এই আশায় প্রণোদিত হইয়া, সকলে মিলিয়া, উঠিয়া সার বাঁধিয়া বসিলাম। উর্দ্ধে মুক্ত আকাশে, তখন তপনদেব বিরাজমান দেখিলাম। কিন্তু আজ তাঁর প্রত্যক্ষ-দর্শন এবং মস্তকোপরি তাঁর এই অজস্র তেজঃস্বরূপিণী করুণা-বর্ষণ ভাগ্য বলিয়া মানিতে পারিতেছি না। ক্লান্তকলেবর ইহার অন্তরায় হইয়া আছে। চট্‌পট্‌ যে তাঁর প্রচণ্ড লোচনের তীব্র দৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে অন্তর্হিত করিব, তরীবাহকের বাহিবার প্রণালী দেখিয়া, সে আশায়ও জলাঞ্জলি দিতে হইল। সে একখানি লম্বা বংশদণ্ডের সাহায্যে একাকী এত লোককে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে!—তারই বা দোষ দিব কি? যাক্ সে দুঃখের কথা। কোন মতে আসিয়া পুনরায় ভূমিতে পা দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, শুধু কি শৈলশিখর আর সরিৎসমুদ্রেই স্বভাবের শোভার সম্পূর্ণতা আছে? খাল-বিলে নাই? কি জানি? সেদিন আমাদের সাম্প্রত বসতবাটীতে আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল। সহযাত্রীদের অপেক্ষায় ডেকের উপর যাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের বিমর্ষ বদন দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আজ ভ্রমণের ফল তত সুখকর হয় নাই।

পি এণ্ড ও কোম্পানী যে, কেন আগে-ভাগেই স্বর্গারোহণ করাইয়া, পরে যাত্রী-দিগের অধঃপতনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তা তাঁহারাই জানেন। অবশ্যই এই উল্টাপথ ধরিয়া যাতায়াতের কোন গূঢ় রহস্য আছেই। আমরা জন্মাবধি শুনিয়া আসিয়াছি "মধুরেণ সমাপয়েৎ"—জগতে যা কিছু মধুর, তা রয়ে সয়ে ভোগ কর। তাহা হইলে যদি "Land of mid-night sun" ছাড়াইয়া আসিয়াছি, তবে আর আমাদিগকে, দেখিবার মত দেখাইবে কি? শুনিলাম এর পর সুইডেন (Sweden) আমাদিগের সাক্ষাৎকারের জন্য সম্মুখেই দণ্ডায়মান আছে, কেবল এই জলটুকু ব্যবধান। কাপ্তান সাহেব যেন ভদ্রতার অনুরোধেই তরীর হাল সে-মুখো করিয়া দিলেন। Norway দেখিতে আসিয়া যদি ফাঁকতালে আর একটা রাজ্যও দেখা যায়, তা মন্দ কি? তবে

এখানকার বৃত্তান্ত দিয়া "নরওয়ে ভ্রমণ" বলিলে তাহা সুসঙ্গত হইবে না, মনে করিয়া, এটাকে 'সুইডেন ভ্রমণ' নামেই অভিহিত করিলাম।

ভোরের বেলা ডেকে আসিতেই সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে, ঐ Stockholmএর বন্দর দেখা যাইতেছে। মনটা খুসী হইল না। এক রাজধানীর ধাক্কা সাম্‌লাইতে না সাম্‌লাইতেই আবার আর একটা রাজধানী! কিন্তু উপায় নাই! পয়সা দিয়া যখন পরাধীনতা স্বীকার করা গিয়াছে; তখন অকারণ মন খারাপ করায় লাভ কি আছে? দিল্‌দরিয়া করিয়াই দেখা যাক্।

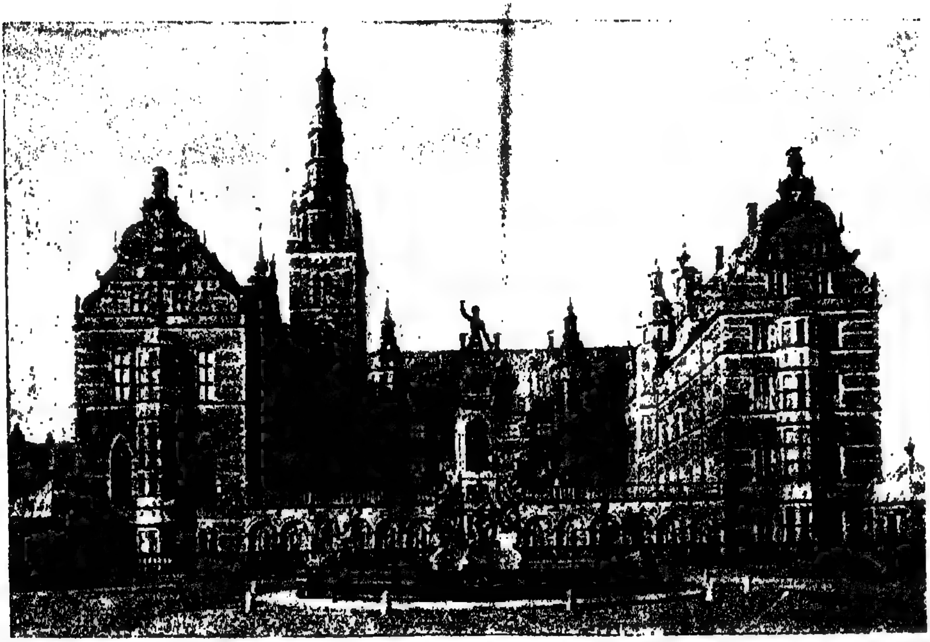

পুরাতন রাজভবন

এখানকার পুরাতন রাজভবন নাকি, এ ঘাট হইতে বহুদূরের পথ। আগন্তুকদের যখন সেটা দেখিয়া যাইবার দস্তুর আছে, তখন আর কুক-কর্ত্তা কি আমাদিগকে রেহাই দিবেন? বিশেষ সে হর্ম্ম্যশ্রেষ্ঠের তিন কুড়ি চারটি কাম্‌রার ভিতরকার কারুকার্য্য না কি প্রত্যেকটির বিভিন্ন প্রকার; তা কি না দেখে থাকা যায়। বর্ণনা ব্যাপারটায়, মুখপরম্পরায়, বিস্তৃতিলাভের সম্ভাবনা থাকায়, উপরিউক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য

প্রত্যক্ষগোচর না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যয় করিতে ইচ্ছা হইল না। দূর হইতে যেমন সকল রাজপ্রাসাদেরই চূড়া দেখা যায়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

তোরণ-দ্বারে প্রবেশ মাত্র প্রহরিগণ, প্রস্তরবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া, আমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইল। গুরুগম্ভীর শব্দে আমাদের শকট সকল, তত্রস্থ পাষাণনির্ম্মিত প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।

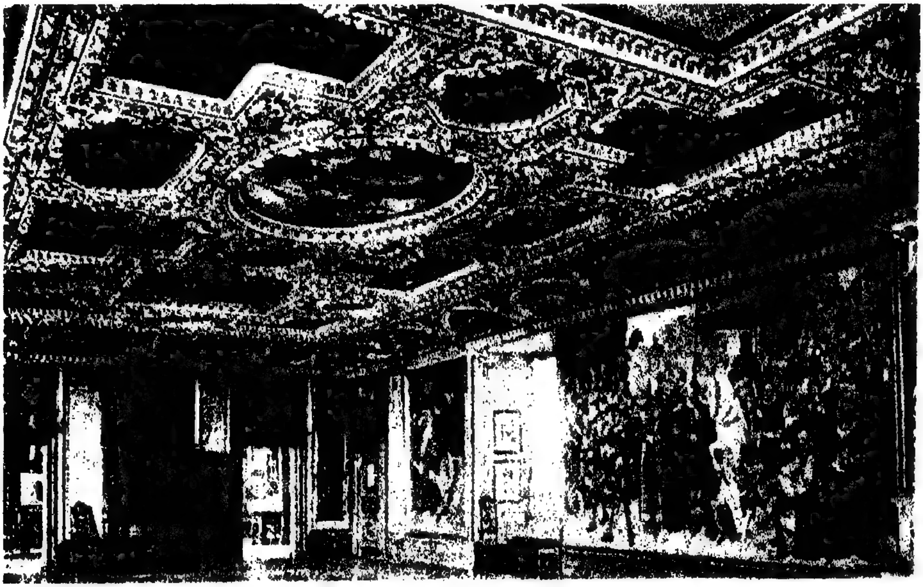

দরবার হল

বিরাট দৃশ্য সন্দেহ নাই। প্রথম প্রকোষ্ঠের ভিতর পদার্পণ করিতেই দেখি, ইহার চতুঃসীমার প্রাচীরের গায়ে, ছাদে এবং মেজেতে, তদানীন্তন সমাজ ও রাজনীতিমূলক চিত্র ও মূর্ত্তি সকল অঙ্কিত আছে। কিন্তু এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় করাইয়া দিবার মত প্রচারক তখনও আমাদের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হন নাই। সে ব্যক্তি বোধ হয় কামচারী, তাই মনন মাত্রই আসিয়া দর্শন দিলেন। আজ তাঁকে নইলে নয়, তাই তাঁকে বড় বন্ধু বলিয়া মনে হইল। কুঠরীর পর কুঠরীর কারিগরি, চিত্র হইতে চিত্রতর, ক্রমশঃ প্রকাশ্য। ইহাদের গঠনের নব নব ধারা যখন মনকে বড়ই আনন্দিত করিতেছিল, এমন সময় আচম্বিতে সকল সৌধচূড়ামণি, তাজ-গরবিণী,

আসিয়া চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তুলনার কথা কাণে তুলিয়া সব ভণ্ডুল করিয়া দিল। আর কিসের কলা! কিসের কৌশল! কার কাছে কি? তোমরা হয়ত বলিবে, সে হ'লো সৌখীন বাদসাহের প্রেয়সী বেগমের সাধের অন্তিমশয্যা! আর এ হ'লো শিক্ষিত সম্রাটের নিজ বাসোপযোগী প্রাসাদ! তা হবে।

অতঃপর আমাদের সেই প্রজ্ঞাবান্ প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রচার-কার্য্য পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল, আমরাও অবসরমত তাহা অবধান করিতে অন্যথা করিলাম না। কিন্তু ওসব দেখিয়া শুনিয়া আর বাহবা দিতে পারা গেল কৈ? বড় জোর "বেশ" বলা পর্য্যন্তই শেষ। পদযুগল ক্রমশঃই ক্লান্ত হইতে লাগিল, শেষাশেষি যেন তারা যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছিল। ফল কথা, এমন সব জায়গা এক বেলায় কাজ-সারা-গোছ দেখায় হয় না। তবে সন্ধ্যার প্রাক্কালে, রক্ষককে যখন মাঠ ঘাট ছাড়াইয়া, পশুপালকে বাড়ীপানে ধাওয়াইতে হয়, তখন এই রকমই হুটোপুটি করিতে হয় বটে।

আরও এক কথা, একটি দুইটি নয়! চৌষট্টিটি ঘর! দরবার হলে গিয়া দেখি, তাহাতে বিচারকের আসন হইতে, বিলাসোচিত নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থাও রহিয়াছে। বুঝি বা তাবৎ দিনের বৈষয়িক কর্ম্মের কঠোরতার মধ্যে, রজনীযোগে উৎসবানন্দ উপভোগের উপাদান লক্ষ্য করিতে লাগে ভাল। ধর্ম্মালয়ের ধর্ম্মাবতারের মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। মানবের দুঃখে দুঃখী যীশুর ম্লানমুখে, আনত চক্ষে, বক্ষে, শিল্পী যে কারুণ্য ফুটাইয়া দিয়াছেন, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। একটি গবাক্ষ হইতে ইহা দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিলাম আজ তাঁর মৃত্যুতে তিনি সফল-মনোরথ হইয়াছেন কি? জীবের দৈন্য ঘুচিয়াছে কি?

এ গির্জ্জার দেওয়ালের গায়ের স্বচ্ছ কাচের ভিতরে, যে চমৎকার চিত্র সমুদায় অঙ্কিত রহিয়াছে, অধুনাতন তদ্দেশীয় শিল্পীদিগের নাকি সে নৈপুণ্য সম্পূর্ণ অবিদিত। এজন্য আমাদের এই গুণজ্ঞ গুরুমহাশয় মাঝে মাঝে বড়ই মর্ম্মপীড়া অনুভব করেন, বলিলেন।

এই হর্ম্ম্যমালা পরিদর্শনান্তর Hamletএর সমাধিস্থানের উদ্দেশে ধাবিত হইতে হইবে, এরূপ আভাস পাওয়া গেল। দেখা যাবে, অমন প্রখ্যাত পুরুষের শেষ পরিণতির অবস্থাটা কি? নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে জলযোগের সময় হইল, এবং তৎক্ষণাৎ একটি একতালা হোটেলের আশ্রয় লওয়া গেল। এটি হোটেলের মত হোটেল বটে। ইহার ভিতরকার বৃহৎ ব্যাপার দেখিয়া তাজ্জব হইলাম। জিজ্ঞাসায় জানা

গেল যে, এ ঘরটিতে সহস্র লোকের স্বচ্ছন্দরূপে আহারে বসিবার মত ব্যবস্থা আছে। পরিবেশকগণ এক দিক্ হইতে অন্য দিকে টেলিফোন্ যোগে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে।

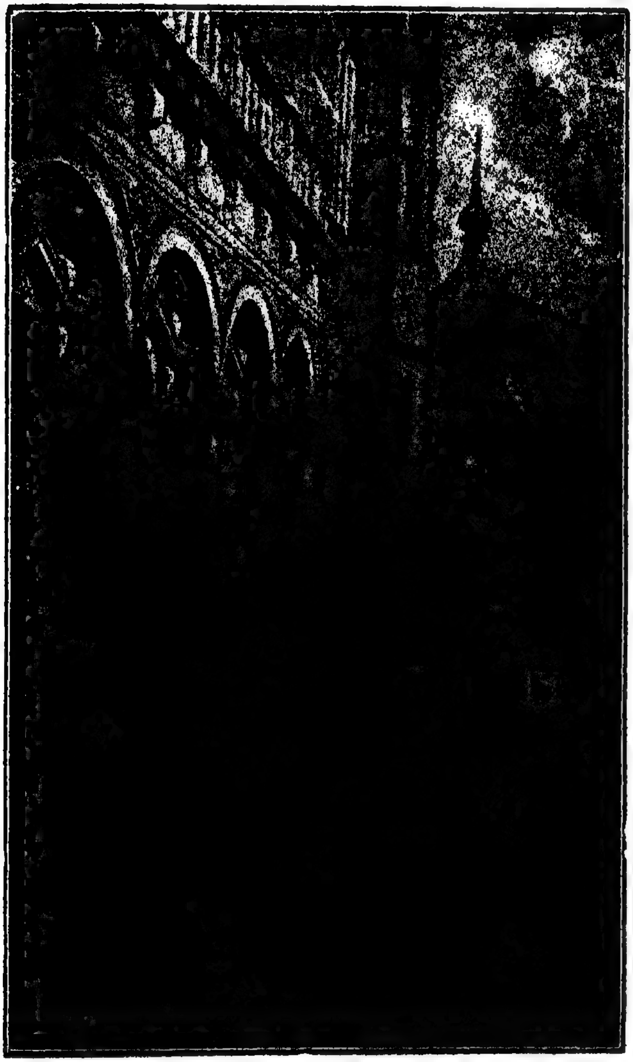

ধর্ম্মালয়

আহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর বিশেষ কিছু পার্থক্য বোঝা গেল না। সেই একঘেয়ে রকমের রান্না। এ সব দেশের দুগ্ধপক্ক মিষ্টান্নের সঙ্গে সঙ্গে, শর্করা পরিবেশনের প্রথা দেখিয়া, আমাদের মত আদত সুধারসজ্ঞ জনের বিশেষ বিরক্তি বোধ হইত। মিষ্টদ্রব্যে মিষ্টতার অভাব আমাদের যেন অসহ্য বোধ হয়।

এদের আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রচুর পরিমাণে থাকে, কিন্তু কোনটাতেই জিহ্বার আসক্তি দেখাইতে নাই। এসব সংযমের ফলে স্বাস্থ্য-রক্ষার যে সহায়তা হয়, তাতে আর সন্দেহ কি আছে? প্রত্যহ, প্রাহ্ণে, মধ্যাহ্ণে, অপরাহ্ণে এবং সায়াহ্ণে এত মহাভোগের আয়োজন সত্বেও কাহারও কোনরূপ শারীরিক উদ্বেগ-ভোগের চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না,

এ কি কম কথা। কিন্তু অভ্যাহার-বিধির বিধান মানিয়া চলা আমাদের দেশের পদ্ধতি নয়। এজন্য খাদকেরা যত না দায়ী, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর প্রবর্ত্তকেরা তদপেক্ষা বেশী দায়ী নয় কি ? আমাদের যত কিছু উপাদেয় সামগ্রী, প্রায় সকলই স্বাস্থ্যনাশের উমেদারী করে। কাজেই আমরা নাচার।

সমুদ্রের তীরেই এই পান্থশালাটি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে। জলনিধিতে নিমজ্জন সুখ-লালসায় স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিবিশেষে বিস্তর লোকের সমাগম দেখিলাম। গঙ্গার ঘাটে অহরহ এ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সে অবগাহনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র বলিয়া, আমাদের সলজ্জ চক্ষুকে মোটেই পীড়িত করে না। পাশের ঘরে গীত-বাদ্যের চর্চ্চা চলিতেছিল। গায়িকার সুমধুর কণ্ঠস্বরে যেন সে অট্টালিকা পুলকিত এবং তন্মধ্যস্থিত ভূতগ্রাম অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। ভাবিলাম, যার কণ্ঠে এত মধু ঝরে, সে না জানি কি রূপ ধরে ? এ গলা কি ঈশ্বর-প্রদত্ত ? না আধার গুণে সাধায় এতটা উৎকর্ষ প্রাপ্ত ? কবিগণ বলিয়া গিয়াছেন "প্রকর্ষমাধার-বশংগুণানাম্"। সে যাহাই হউক, এটা যে বেশ উঁচুদরের গান ("high-class singing") তা'ত শ্রোতাদের ভাবগতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল। এস্থলে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য high-class music or singing, দুই একবার বই শোনা ভাগ্যে ঘটে নাই বলিয়া আজ এ গানের রসাস্বাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলাম।

এ বিষয়ে পাকা সমজদার না হইলে, পাছে, অজ্ঞতানিবন্ধন অস্থানে অসামঞ্জস্য ভাবের প্রশ্রয় দিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ি, সে আশঙ্কাও যথেষ্ট ছিল। আবার পরের হাসায় হাসা, বা পরের কাঁদায় কাঁদিতে যাওয়া কম বিড়ম্বনা নয়। কি করি! যখন সে গানকর্ত্রীর সাক্ষাৎ দর্শন-লাভ হইল, তখন তথাকার শ্রোতৃবর্গের নিস্তব্ধ নিঃস্পন্দ ভাব দেখিয়া, অনুমান করিয়া লইলাম যে, সে কণ্ঠে তবে তৎকলাসম্ভূত বিশেষে কোন কারদানি চলিতেছে ; অতএব অবাক্ হইয়া স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান থাকাই শ্রেয়ঃ। তারপর, গানশোনা শেষ করিয়া, পদব্রজেই আমরা সকলে, হেম্‌লেটের গোরস্থানের দিকে রওনা হইলাম। কুক্ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী স্বয়ং আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। অমন স্থানে যাইতে হইলে, স্বভাবতঃই মনটা নম্র হইয়া আসে, ভবলীলার অনিত্যতা স্মরণে জাগে ; মৃত্যুর মহিমায় আর বাহিরের আনন্দ-উল্লাসে মতি থাকে না।

আমরা যে পথ ধরিয়া চলিলাম, তাহার দুই পাশেই সারিবাঁধা সরল বৃক্ষ সকল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। দিনটী বড়ই পরিষ্কার ছিল। একটু পথ চলিতেই,

আমাদের মালিক একটি ভগ্নাবশেষ ইষ্টকের স্তূপের নিকট শান্তভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁর অনুযাত্রিগণও সেই প্রকার দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন ; তখন তিনি সসম্ভ্রমে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক, সেই বল্মীক-সদৃশ পদার্থটিই যে সর্ব্বজনবিদিত মহামতি হেম্‌লেটের ভূশয্যার উপরে স্থাপিত, ইহা নির্দ্দেশ করিলেন। প্রথমে একটু বিস্মিত হওয়ার পর আমাদের মধ্যে কোন কোন নষ্টবুদ্ধি দর্শকের মনে ইহার সত্যতা বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ জন্মিল ; কিন্তু এত বড় অবৈধ কথাটা বলিয়া ফেলিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। কেবল কাণাকাণিই সার হইতেছে দেখিয়া, খোস মেজাজী আমার অগ্রজ এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার আপনি লইলেন। তখন তিনি পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে ভাই! যথার্থ বল দেখি, এইটি তাঁরই সমাধি নাকি? না লোকের চোখে ধূলি দিবার জন্য এ তোমাদের নিজের মনগড়া কিছু?" তখন সে ভদ্রলোকটি

হেমলেটের সমাধি

হাসির চোটে কথাটা একদম চাপা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দাদাও আমার নাছোড়-বান্দা, তাঁর কথার জবাব না দিলে চলিবে না। তখন সে ব্যক্তি, আমাদের মনে এরূপ সন্দেহ জন্মিবার কোন বিহিত কারণ না পাইয়া, একটু কৃত্রিম রোষভরে বলিলেন—

"এ তোমাদের জুলুম! যাই বল, নিজ চক্ষের দেখা নয় যখন, তখন শপথ করিয়া বলি কেমন করে, বল দেখি।" আমরা শিষ্টাচারের অনুরোধে, সে সমাধিতেই হেমলেটের নশ্বর দেহের অবশেষ আছে মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, মৃতদেহের নামে এ নষ্টামি কিন্তু আমাদের দেশের লোকের কল্পনায়ও আসে না। সত্যপরায়ণ সভ্যদেশেরই এ সব সাজে। আজিকার দেখার পালা এখানেই শেষ হইল। আমরা একটু ক্ষুণ্ণ মনেই বাসভবনে ফিরিয়া আসিলাম। সহরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে যা কিছু নয়নাভিরাম সমুদায়ই দেখিলাম।

জাহাজে আজ কদিন ধরিয়া, একটি বর্ষীয়সী রমণী আমার সঙ্গ লইয়াছেন —কি মনে করিয়া তা বলিতে পারি না। আমি যেখানে যাই, তিনি নির্ণিমেষ-নেত্রে আমায় নিরীক্ষণ করেন। সহসা একদিন একেবারে সম্মুখে আসিয়া, আমার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—"যদি কিছু মনে না কর, তবে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কইতে চাই।" "অভ্যার্থনৈব ইয়ং তে প্রার্থনা মন্যে" বলিতে গিয়া ত বাক্যজড়তায় আমি একেবারে গলদঘর্ম্ম হইলাম। তিনি প্রথমেই বলিলেন যে, তিনি অল্পদিন হইল, স্বামি-বিয়োগে একটু চঞ্চল হইয়া, দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁর হীরা-মুক্তায় জড়িত বেশভূষা দেখেই ত আমার চোখ্ দুটো বিগ্‌ড়ে গেল। তবে মুখখানি করুণরস মিশ্রিত দেখিয়া, কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। ইংরাজীতে যাকে বলে, Eccentric: হাবভাবে আমার তাই মনে হইল। আমার আপাদমস্তক শুভ্র বস্ত্রে আবৃত দেখিয়া, আমাকে কুমারী সম্বোধন করিতেই আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিয়া, আমাদের দেশাচারের কথা উল্লেখ করিলাম।

তখন তিনি সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আমায় তবে তুমি নিশ্চয়ই একটা বিলাসপ্রিয় স্ত্রীলোক ভাবছ, কেমন? আমার একটা ভারি দোষ যে, আমি সমাজের নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে কখনও থাক্‌তে ভালবাসি না; তাই দেখ না, আমি কাল পোষাক পরি নাই। এতে লোকে আমাকে বড় নিন্দা করে, আমার তাতে বড় আনন্দ হয়। আমাদের জাতিটাকে আর আমাদের ধর্ম্মটাকে আমি দস্তুর মত ঘৃণা করি। তুমি শুনলে আশ্চর্য্যান্বিত হবে যে, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না!" আমাদের দেশে নাস্তিক নারী নাই বলিলেই হয়, তাই তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমার একটু কেমন কেমন লাগল। তবে ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষত্বের একটা আকর্ষণ আছে ত? কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, ইনি উচ্চ-কুলোদ্ভবা, সুশিক্ষিতা; তবে এই গলদটুকু ইঁহাতে আছে কেন? যাক্, আমি

আর বাধা না দিয়া তাঁকে বলিতে দিলাম। তিনি বলিলেন—"আমার স্বামী এখন কোথায় কি ভাবে আছেন, আমার আদৌ এ চিন্তা আসে না, অথচ আমি যে ফের বিবাহ করব, তা মনে করো না! আমার স্বভাব-দোষে বন্ধুজন বড় জোটে না। এই দেখ না, এত লোক আছে, আমি তবু কেমন তফাৎ তফাৎ থাকি। আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একদম একা কাটাই। খাই দাই, বেড়াই,—সব আপন মনে। স্বামী যখন ছিলেন, আমার এই একাফেরা স্বভাবে তিনি ভারি বিরক্ত হইতেন। আমি যে কেন বিয়ে করেছিলাম, তাই ভাবি। লোকটা নেহাৎ আমায় দেখে ক্ষেপে গেলেন। আর মানুষটাও ছিলেন ভারি ভণ্ড, আর ধূর্ত্ত; তাই দেখে আমার তাঁর

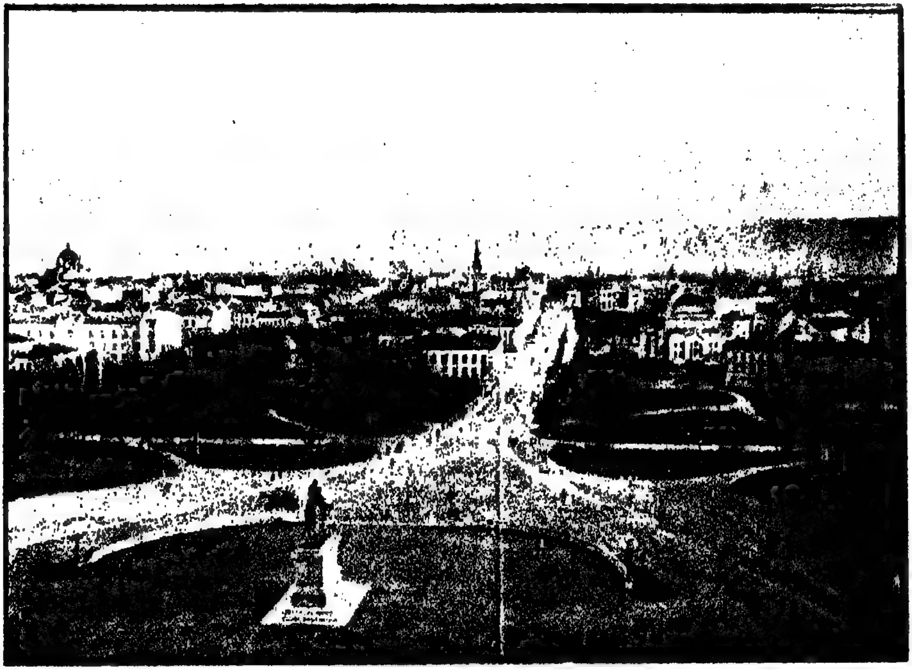

সহরের দৃশ্য

প্রতি একটা খেয়াল চাপল। গির্জ্জায় নিয়ে বিয়ে কর্ত্তে দিলাম না; আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে, মন্ত্র পড়তে পারব না, হলপ করে বল্লুম। তিনি হেসে রাজি হলেন।

বিয়ের পর তিনি বেঁচে ছিলেন বছর দশেক, কিন্তু আমি তাঁকে কিছুতেই আমল দিতাম না। মাঝে মাঝে ভয় দেখাতেন, বলতেন—উইলে কিছু দিয়ে যাবেন না। আমি সে কথায় ভ্রূক্ষেপও কর্‌তাম না। লোকটার একটা বড় দুর্ব্বলতা ছিল, আমাকে বড় ভালবাস্‌তেন, তাই আমার এত দোষ সত্বেও আমাকে সব দিয়ে গেলেন। আমি উইল পড়ে লজ্জা পেয়েছিলাম। আজ অবধি তার এক পয়সাও নিজে ছুঁই নাই; আর আমাদের দেশের হিসাবে কোন ভাল কাজেও তা দিই নাই। তোমার হয় ত জানতে কৌতূহল হচ্ছে, যে সে টাকাগুলি কি করলাম? তোমাকে ডেকে যে আজ এসব কথা কেন বল্‌ছি, তা নিজেই জানি না। বোধ হয় এত দূরদেশের লোকের সঙ্গে এর আগে কখনও আমার দেখা হয় নাই, তাই তোমার সঙ্গে পরিচয় কর্‌বার জন্যে আমার মনে একটা অসম্ভব আগ্রহ হয়েছিল; কিন্তু সাহস পাই নাই। আর একথাও মনে হয়েছিল যে, যদি তুমি আমার ভাষা না জান।" এই বলেই "আজ এ পর্য্যন্তই" বলে তিনি আপনার আরাম-কেদারায় মুখখানা রুমাল দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। এমন কোন খাপছাড়া কথা পাইলাম না যে, তাঁহাকে খেপা ভাবিব। ও রকম খামখেয়ালী বলেই বোধ হয়, ওঁর সঙ্গে আরও কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইল। সুযোগ পাইলেই আবার তাঁহার তল্লাসে আসিব, এরূপ সংকল্প করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলাম। এখন আর আমাদের বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই। সেদিন চলিয়া গিয়াছে।

জাহাজে আমরা তিন শত আশী জন আরোহীর মধ্যে কত দেশী লোকই যে ছিলাম তার ঠিকানা নাই। প্রথম দুই চারি দিন কেহ বড় আমাদের কাছে ঘেঁসিত না। কিন্তু তারপর হইতেই এই প্রাতঃসন্ধ্যার শুভকামনাসূচক সম্ভাষণ প্রতিগ্রহণ করিতে করিতে আমাদের একেবারে প্রাণান্ত। ইহার একটি গুপ্ত কারণ ছিল। প্রথমে যখন আমরা কৃষ্ণকায় কজন এই জলযানে অধিরোহণ করি, তখন দূর হইতে কুটিল ভ্রূকুটি ভিন্ন আমাদের ভাগ্যে আর বেশী কিছু জোটে নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়া, দূরদর্শী দাদা আমার একটু বড়াই করিয়াই বলিয়াছিলেন, "সবুর কর না, যখন যাত্রীদিগের পদবীর সহিত নামের তালিকা প্রকাশিত হবে, তখন এরাই কেমন উল্টা সুর ধর্‌বে।" এই পদোপাসক জাতটা আগন্তুক হইতে, পরম আত্মীয় পর্য্যন্ত কেবল লোকের খেতাব-মাফিক খাতির করে। বস্তুতঃ কার্য্যেও তাহা দেখিয়া ভাবিলাম—ভাগ্যে ভগবান্, সম্প্রতি তাঁর কালো ছেলের "কৃষ্ণ" নামের

আগে পাছে, গোটাকতক বাছা বর্ণের বিনিবেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই চটকে আমরা পর্য্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিলাম।

এই ষ্টকহলমে অনতিদীর্ঘ, অনতিপ্রস্থ, অতি পুরাতন একখানি অর্ণবপোতের ভগ্নাবশেষ-দর্শন নাকি টুরিষ্টদের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে। কারণ, এই নামধেয় পদার্থের ইহা সর্ব্ব প্রথম সৃষ্টি বলিয়া এদেশের প্রচলিত প্রবাদ। জলনিধিতে যাতায়াতকালে, অকস্মাৎ এক ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে নিপতিত হইয়া ইহা জলমগ্ন হয়; পরে কতিপয় ধীবর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইলে, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে সযত্নে সংরক্ষণ করিয়াছেন। এদেশের প্রাচীন-কীর্ত্তির প্রতি আমরা ক্রমশঃই কেমন সন্দিগ্ধচিত্ত হইতেছিলাম। চিত্ত সন্দিহান্ থাকিলে চক্ষের দৃষ্টিকে সরল রাখা যায় না; কাজেই মনে নানা কূট প্রশ্ন আসে।

বায়ু-চালিত 'জাঁতা'

যথাস্থানে গিয়া, আর-আর সঙ্গীদের সঙ্গে উহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা একে একে প্রায় সকলেই তদুপরি আরোহণ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল দর্শন করিতে লাগিলেন; আমরা তখন ইহার পৃষ্ঠদেশভঙ্গের আশঙ্কায় সশঙ্ক রহিলাম। যখন সকলে নির্ব্বিঘ্নে নিম্নে পুনঃপদার্পণ করিলেন, তখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

তথা হইতে অনতিদূরে, এক Open-air Museumএ গেলাম এবং ফিরিবার মুখে এক বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একটি নূতন ধরণের Mill দেখিলাম। ইহা বায়ুর সাহায্যে পরিচালিত হইয়া, দ্রব্যসামগ্রী পিশিয়া গুঁড়া করে। যাইতে যাইতে অসংখ্য পাহাড়-পর্ব্বতের দেখা পাইলাম, কিন্তু এদের কাহারই যেন সে প্রাণ নাই, নেহাৎ থাকিতে হইবে বলিয়াই যেন আছে, স্থানান্তরে যাইতে পারিলেই যেন বাঁচে! তখন করুণার্দ্র-চিত্তে কামনা করিয়াছিলাম, সমতল সোণার বাঙ্গালায় ইহাদের কতকগুলির আমদানা করাই। কিন্তু সে সব "সুরসদ্মবাহা বৃহন্তো হংসাঃ" ত আর এখন নাই! তা ছাড়া বিদেশী জিনিষপত্রে, একেই তো বঙ্গমাতার ক্রোড় বোঝাই,—ইহাদের রাখিবার স্থানই বা কোথায়? ইত্যাদি চিন্তায় এই আজ্‌গবী বাসনাকে আর ঠাঁই দিতে পারিলাম না।

সুইডেনের আরো ছোটোখাটো দুই চারিটি স্থানে গেলাম। কিন্তু, কোথাও কোন পরিবারের সঙ্গে আলাপ না হওয়াতে, এখানকার সামাজিক রীতিনীতি জানিবার সুযোগ ঘটিল না। Swedishরা, Norwegianদের মত তত সুশ্রী না হইলেও, সাধারণতঃ সকলেই বেশ সমদর্শন; এদেশে ধনশালীর সংখ্যা বেশী নয়। শ্রমজীবীরা অনেকেই কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনধারণ করে। দীনদরিদ্রের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের উপায় নাই বলিয়া, সকলকেই খাটিয়া খাইতে হয়। ইহারা যেমন পরিশ্রমী, তেমনই সুস্থকায়। তবে আমাদের অসিত-অঙ্গে যে মলিনতাটুকু একেবারে মিশ খাইয়া যায়, ইহাদের শ্বেতচর্ম্মে তাহা ধরা পড়ে বলিয়া একটু দৃষ্টিকটু হয়। এদেশের 'সার্ডিন্‌' মৎস্যের বিস্তর রপ্তানী হয়। প্রতিদিন ধীবরগণ-কর্ত্তৃক ইহারা লাখে লাখে ধৃত হইয়া, সুস্নিগ্ধ তৈলনিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিনাগারে রক্ষিত ও বন্ধীকৃত হইয়া দেশ-বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহা বড়ই সুস্বাদু বলিয়া স্থানীয় তাজা মাছ ছাড়িয়া অনেকে ইহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা মৎস্য-প্রধান-দেশবাসী হইয়াও ইহার প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাতিতা দেখাইয়া থাকি। বিদেশী বস্তুর নেশা এম্‌নি আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে!—সুইডেনের দিয়াশলাই ত এখন আমাদের ঘরে ঘরেই দেখা যায়, সুতরাং এ ব্যবসায়ের যে কি পরিমাণ আয়, তা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বিশেষ বৃক্ষের কাষ্ঠে ইহা নির্ম্মিত হয় এবং এ বৃক্ষ এ দেশের যথা তথা জন্মে। এ জন্য বড় বড় কাষ্ঠব্যবসায়ীরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট জমীতে ইহা সংরোপণ করিয়া সযত্নে রক্ষা করে। অনেক স্থানে ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। আমরা এই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার্য্য বস্তুটির প্রস্তুত-প্রণালী দেখিয়া আসিতে পারিলাম না, এই বড় দুঃখ রহিয়া গিয়াছে। এজন্য কুক্

কোম্পানিই দায়ী, বলিতে হইবে। যদি তাঁহারা, দুই একটা গির্জ্জা দেখান বাদ দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সেই সকল কলকারখানা দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন, তবে আমরাও তফাৎ হইতে যীশুকে উদ্দেশ করিয়া, তাঁহাকে আমাদের অন্তরের ভক্তি জানাইয়া, অনেক উৎপাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতাম। এই ঔষধ-গেলা-গোছ গির্জ্জা দেখায় আমাদের বস্তুতঃই বড় অরুচি ধরিয়াছে। আমাদের দেশের দেবালয়ের অবধি নাই ; কিন্তু তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতে বিভিন্নরূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকায়, পর্য্যাটকের পক্ষে কৌতূহলপ্রদ হয়। যে দেশে নারীজাতির এত খাতির, সে দেশে দেবীপ্রতিমার পূজা নাই!---এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! একই নরমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, আমাদের নয়নে আয়াস আসে ; যদিও প্রকৃত জীবনে আমাদের আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে।

দুই দিনের পর, আজ এই রাজস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ। তখন প্রণত পারাবার আবার দুইদিন তাঁর আতিথ্যস্বীকার করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন এবং আমাদিগের চালক "তথাস্তু" বলিয়া আমাদিগের শরণ-সহ তাঁহার শরণাগত হইলেন! যাঁহারাই জাহাজে কিছু দিনের পথ যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এ পুণ্যপুরীতে প্রায়শঃ বহুবিধ প্রণয়-প্রসঙ্গ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, তদুপযোগী স্থান ও জন ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। শুনিয়াছি, সন্তানের শুভকামনায় অনেক পিতামাতা, বয়স্থা দুহিতাদিগকে এস্থানে প্রেরণপূর্ব্বক ভাবি ফলাফলে আশ্বস্ত হন। তবে বয়সনির্ব্বিশেষে ধৈর্য্যবিলোপী কুসুমায়ুধ অনেক সময়েই অস্থানে শরসন্ধান করিয়া অকারণ অন্তর্জ্বালার সূত্রপাত করেন। আমাদিগের এ প্রবাসে আসা অবধি, প্রতিদিন কত হৃদয় সমর্পণ, গ্রহণ, হারাণো কুড়ানো,--কত কি হইতে লাগিল। কখনও এক রাঙ্গা পায়, দশটা মাথা লুটাপুটি যায়, তবুও মন পাওয়া দায়! আবার যেখানেই বয়সটা দোটানা-গোছের হইয়াছে, জীবনস্রোতে ভাটা লাগিয়াছে, সেখানেই প্রায় 'খামাখা গৌরাঙ্গ মোরে রাখ তব পায়' চলিয়াছে। মোটকথা, এ প্রহসনে নিতান্ত অস্তদন্তহীন "Wrinkled piece of womanhood" না-হইলে, কোন অঙ্গনাই দর্শকদলভুক্ত হইয়া থাকিতে চান না। এক্ষেত্রে অভিনেত্রী হইবারই অভিলাষ বেশী। এরা প্রেম জিনিষটাকে এত হাল্‌কা করিয়া ফেলিয়াছে যে, যে-সে, যখন-তখন, যা-তা, প্রেম-সঙ্গীত গাহিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে না। আমাদের, ভাবপ্রধান দেশের লোকের চোখে কিন্তু এসব বড় ঠেকে!

কিসে, কে কি ভাবিয়া বসে, সেই ডরাসেই তারা সুখের চেয়ে শোয়াস্তি ভালবাসে! স্বভাবতঃ নির্ভীক বলিয়া, এসব দেশের রমণীগণ কিছুতেই প্রায় স্ত্রী-বিজিতা হন না; সুতরাং, তাঁরা মানেরও ধার বড় ধারেন না। ইহা তাঁহাদের পুরুষদের পক্ষে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, আমরা তার বিচারক নই। তারপর এ প্রবাসে প্রেম-পত্রের যা ছড়াছড়ি, তার আর বিশদ ব্যাখ্যা কিবা করি! জাহাজে কাহারও কোন জিনিষ হারাইলে একটা নোটিসে "Lost" এবং তার স্বরূপ লিখিয়া, সিঁড়ির সম্মুখে দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গাইয়া রাখিবার রীতি। হঠাৎ একদিন সেখানে হাসির ধুম পড়িয়া গেল। ব্যাপারখানা জানিবার জন্য নিকটে গিয়া দেখি, লেখা আছে "Lost! One heart last night in the dance,—360 beats in a minute!" এবংবিধ রঙ্গ তামাসা নিতাই এখানে হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জলপথের এই দীর্ঘ দিন কটা আমোদে কাটান লইয়া কথা। কিন্তু এই আমোদজনক বিষয় যদি আসলে গিয়া পরিণত হয়, তখন তাহা শোভনীয় কি শোচনীয় হয়, বলা শক্ত। ভাবিয়া দেখিলে, সুরা-সুন্দরীর সেবায়, আর কন্দর্প দেবের ভজনায়, অবস্থা উভয়তঃ সমানই গিয়া দাঁড়ায়।

এই সব ভাবিতেছি, এমন সময় কে পরিচিতের মত আমার কাঁধে ভর করিয়া, পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখ ফিরাইয়া দেখি, আমার সেই সদ্যঃপরিচিত সুলোচনা। জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেই-যে সে-দিন তোমার দেখা পাই নাই কেন?" ঈষৎ হাস্য করিয়া সে বলিল—"আপনাকে আব্‌ডাল করিয়া রাখিয়াছিলাম, এই বাহ্য প্রকৃতিটা আমাকে মাঝে মাঝে বড় জব্দ করে। যখন বড়-ঝাপ্টা, আমার বুকের ভিতর যেন কি চেপে ধরে!—আমি তখন কেবল কাঁদি—কেবল কাঁদি। যে দিন গুমট্ ভাব দেখি—সে দিন আর আমার মুখ দিয়া কথা সরে না, যেন জীবনে মৃতের মত থাকি। উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে আমি যেন প্রাণ পাই; বড় ধুম করিয়া পোষাক পরি গহনা গায়ে দিই, বড় আনন্দ মনে হাসি, গাই, খাই, দাই। ইহার এই অদ্ভুত জীবনরহস্য আমাকে বড়ই কৌহতূলী করিল। মনে মনে ইহার আসঙ্গ-লিপ্সা বাড়িতে লাগিল। বিশ্রব্ধ সৌম্য-ভাবে প্রণোদিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"তুমি সে দিন বল্লে, তোমার স্বামীর উইলের টাকা তুমি ছোঁও নাই, তবে তা কি কর্‌লে?" সে বলিল—"তুমি শুন্‌লে কি কর্‌বে, জানি না; আমি তার সবটা তোমরা যাদের বড় ঘৃণার চক্ষে দেখ, তাদের দিয়ে দিয়েছি। তারি মধ্যে দু-চারজন সে টাকায় আপনাদের ঘরবাড়ী করে, পরের দুয়ারে খেটে খেয়ে-দেয়ে আছে। কেউ কেউ তা দিয়ে ভাল লেখাপড়া শিখ্‌ছে, আবার কেউ কেউ,

আমায় ফাঁকিও দিয়েছে! ওরা সবাই সুখদুঃখের কথা নিয়ে আমার কাছে আসে—বসে, আমাকে বড়ই ভালবাসে। এজন্য আমাদের স্বর্গ-নরক-ভোগ-বিচারকর্ত্তারা আমার বাড়ীর ত্রিসীমায় পা দেন না। আমিও বেঁচেছি! আমি দেশ দেখে বেড়াই, তাতেই ভারি ফূর্ত্তি পাই।" এর কাছে ধর্ম্মের বড়াই করিতে লজ্জা বোধ করিলাম। এর মুখে এমনি একটি অলৌকিক জ্যোতি ছিল, যে ইঁহাকে তুচ্ছ করিব, এমন ভণ্ডও হইতে পারিলাম না;—শুধু ভাবিলাম,—এওত তাঁরি সৃষ্টি!

কথাবার্ত্তায় জানা গেল, ইহার বেশ পড়াশুনা আছে। অনেক সময়, সে আধ্যাত্মিক, মানসিক, বৈজ্ঞানিক বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত। সব কথা আমার বিদ্যা বুদ্ধিতে বোঝা, বা বুঝাইয়া বলা কুলাইত না,—বিশেষ বিদেশী ভাষায়। কিন্তু যাহা কিছু অজ্ঞেয়, অজ্ঞাতে আমরা—অজ্ঞানেরা—তাহাতে অনেক সময় ভক্তিমতী হইয়া

সুইডিশ্ জনসাধারণ

পড়ি। সেটা আমাদের ধাতের ধারা; কি করি! এ ক্ষেত্রে বিদ্যাবিশারদদিগের ব্যঙ্গোক্তিতে আমরা বধির।

পরদিন প্রত্যূষে, ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে জাগ্রত হইয়া উঠিলাম। নিশ্চয়ই নিবিড় কুজ্‌ঝটিকার কুহেলিকায় পড়িয়াছি ভাবিয়া, প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। Port holeএর পরদা সরাইয়া দেখি, দিগ্‌দিগন্ত যেন ধূমজালে আবৃত! ডাহিনে-বামে, সম্মুখে পশ্চাতে কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না; অথচ অগ্রসর হওয়া চাই!

তবে কি এই মান-বিবর্জ্জিত, অবগুণ্ঠনে অপরিচিত দেশে, মাধুর্য্যলীলার এক অভিনব অনাস্বাদিত রসের সঞ্চার করাইবেন বলিয়া, দিগ্বধূগণ মিলিয়া এ চক্রান্ত করিয়াছেন! মানের উছিলায় একেবারে "বদনন-কমল ঝেঁপে বসা"! কিন্তু এ বংশীধর ত আর "স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু"র বার্ত্তা জানেন না! কেবল বাঁশরী বাজাইলেই হয় না, সেই মনভুলান বাজানো জানা চাই। কাজেই অবগুণ্ঠনও অপসারিত হইতেছে না দেখিয়া ত, ইনি, এক ভয়ঙ্কর বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া, আতঙ্কে একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হইলেন। তবে কি আজ অপঘাত মৃত্যু? একা হইতেন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু, তাঁর শরণাগত জনকেও যে, তৎসঙ্গে এই লবণাম্বুরাশিতে হাবুডুবু খাইয়া, লবণাক্ত শরীরে লয় পাইতে হইবে! কৌতুকময়ীরা কি করুণাবশে একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? যে দেশে যে রসের অনুভূতি নাই, তাকে তা পাওয়াইতে যাওয়া কেন ভাই? বুঝি বা এ অনুনয়ে কাজ দেখিল! তখন যথার্থই তাঁহাদের এই ললিত-বিভ্রম ব্যর্থবোধে, ধীরে ধীরে আপনাদের অভেদ্য আবরণ উন্মোচন করিতে লাগিলেন। সকল উৎকণ্ঠার উপশম হইল। সকলেই গা-ঝাড়া দিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে এই প্রমোদভবনের উৎসব আনন্দে উপভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আজ নাকি সারা দিন প্রহসন চলিবে,—বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। আর এ জলপথে বিদেশে-যাত্রার দিন ত ফুরাইয়া আসিল। অতএব এখানকার সমগ্র লীলাবিধির এক সংস্মরণীয় স্মৃতি সঙ্গে লইয়া, তবে ত আপন আপন দেশে ফিরা। তাই আমোদপ্রিয়-জাতটা বাকি দিন ক'টা, প্রাণভরে আশ মিটায়ে হেসেখেলে নিতে চায়। আমরা সবটাতে যোগ দিতে পারিতাম না,—এও আমাদের ধাতের দোষ। নোটিসের আর-আর-সব বাদ দিয়া, বৈকালের "Variety Entertainment" দেখিতে বসিব, ঠিক করিলাম। কে কি করিবে, তার একখানা তালিকা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গে এক বেহারী বন্ধু ছিলেন, খোসগল্প বক্তার মধ্যে তাঁহার নাম রহিয়াছে। ছাতুখোরের দেশের লোক হইলেও, সম্ভ্রান্ত-বংশের সন্তান বলিয়া আর-আর দশজনের মতই, ইনি সুশিক্ষিত ও সম্মাননীয় ছিলেন।

তবে, এত সব শাদা মুখের সাম্‌নে, লোকটা না জানি কি বলিতে কি ভণে, মনে মনে এই একটা খট্‌কা রহিয়া গেল। তারপর, এক লাবণ্য-ললামভূতা নাকি বেহালার তানে বেহাল করিয়া দেবার মত বাজাইবেন। ভুজঙ্গের অঙ্গভঙ্গিমায় নর্ত্তনের ভার এক চিত্তহারিণী তরুণীর প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ইতালীদেশীয় এক যুবক পিয়ানো যন্ত্রে তাঁহার সিদ্ধহস্তের প্রমাণ দিবেন। গায়ক গায়িকার নাম নানা জায়গায় লিখা আছে—ইত্যাদি—ইত্যাদি লম্বা 'লিস্ট'। সময়মত, সকলে সমবেত হইলে, পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে P. & O. কোম্পানীর বেতনভোগী বাদ্যকরেরা গৌরচন্দ্রিকা করিলেন। একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তদুপরি আরোহণ এবং কলাকৌশল প্রদর্শন ও ততঃপর নিষ্ক্রামণ চলিল। ইহার কত কত জায়গায়, আমাদের মতে উচ্চহাস্য—এমন কি অট্টহাস্য—হইবার কথা ছিল, কিন্তু তথায়ও যখন কেবল "কিঞ্চিল্লক্ষ্য দ্বিজম্‌" মাত্র হইল, তখন এদের সংযম-শক্তিতে বলিহারি গেলাম! পাছে আমাদের "সাস্রক্ষম্‌" বা "সাংসশিরঃ কম্পাম্‌" হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে জিহ্বাকে পুনঃপুনঃ দন্তপীড়িত করিয়া, তবে গিয়া এই সভ্যসমাজের শিষ্টাচার-বিধি অবলম্বনে সমর্থ হই। এক একজন সুচারুরূপে আপন-আপন কার্য্য সমাধান করিতেছে, আর করতালির চোটে অর্ণবপোতের অন্তঃস্থল মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। যে বরাননা বেহালার তানে সকলকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁকে ত মধুলিহের মত সকলে ঘেরিয়া ফেলিল। তা না হবে কেন? কবিরা বলিয়া থাকেন—"সুলভা রমাতা লোকে, দুর্লভং হি গুণার্জ্জনম্‌"; ললিত-লবঙ্গলতারা যদি আবার কলাবিদ্যা সমন্বিতা হন, তবে ত ভ'র দুনিয়াই তাঁদের পায়! এবারে আমাদের বেহারী বন্ধুর মঞ্চে আরোহণ।—তা তিনি বেশ সপ্রতিভের মতই আপনার বক্তব্য বলিয়া গেলেন। কৌতুকী-কথা বলিবার ধরণটিও প্রশংসনীয় মনে হইল। নিকটে পাইয়া, অনেকেই করমর্দ্দনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। তখন আমরাও, একদেশী বলিয়া, একটু গর্ব্ব অনুভব করিলাম। এই সকল আনন্দ-সজ্জার যথাবিহিত পারিতোষিক দেওয়া আছে। সকলেই জানেন, এজন্য জাহাজে দস্তুরমত club গঠিত হয়, এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে পাউণ্ডখানেক, কি তদধিক, চাঁদাও আদায় হয়। এবং সকলেই সন্তুষ্টমনে এ কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। আমাদের সংখ্যাও, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে, কম ছিল না; কাজেই, এতদর্থে বহুমূল্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করাও সম্ভব হইয়াছিল। রাজধানীর বিপণিসকল হইতেই তাহা সংগৃহীত হইতে লাগিল।

কিছুদিন হইতে আমাদের ফিয়ড্-বন্ধুবর যে কখন কোন্ ছলে ভাগিয়াছেন, ভগবান জানেন। আর তাঁর দেখাসাক্ষাৎ নাই।—সিন্ধুরাজেরও ইহাতে কিছু সঙ্কেত ছিল, এরূপ সন্দেহ করি। কেননা নূতনের মোহে পড়িয়া, আমরা পুরাতনে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছিলাম; বুঝিতে পারিয়া, সন্তর্পণে ইনি ইহাকে সরিয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। বেশী ঘনিষ্ঠতায় অনেক সময় মোহের গ্রাহিণী শক্তি টুকু নষ্ট হইয়া যায়। মোহের স্মৃতিটুকুই বড় মধুময়। তাই আজও ফিয়ড্‌কে ভাবিতে, তার বৈচিত্র্য চিন্তা করিতে করিতে এক স্বপ্ন রাজ্যে বাস করি! ভাবি—"কোন স্থলগনে আর দেখা হবে কি গো দুজনায়।"

আজ প্রভাতেই পারাবার আমাদিগকে তীরভূমিতে পৌঁছাইয়া দিনেক দুদিনের তরে, এই অবিশ্রান্ত অতিথি সৎকার হইতে একটু অবসর গ্রহণ করিবে। চাহিয়া দেখি, চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী সকলে পাল উড়াইয়া দিয়া, ধীবরগণ, আমাদিগকে ইঙ্গিতে আগুয়ান হইতে আহ্বান করিতেছে। এই অকুল পাথারে কুলের সন্ধান পাওয়াইবার ইহারাই অগ্রদূত। Sweden ছাড়াইয়া এবারে Denmark এর এলাকায় আসিয়া পড়িলাম। এই বন্দরটী অতি বিশাল। নানাদেশ বিদেশের জাহাজ সকল নোঙ্গর করা আছে। এই Copenhagen, রাজধানীর মধ্যে প্রধান বাণিজ্য স্থান। এতগুলি জলযান ঘাটে বান্ধা দেখিয়া তার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। সম্প্রতি এখানে প্রকাণ্ড প্রদর্শনী মেলা চলিতেছে শুনিলাম। অতএব সোনায় সোহাগা! একত্রে অনেক দেখা হইবে। লণ্ডনে থাকিতে দাদার সঙ্গে একটী Danish ভদ্রলোকের আলাপ ছিল। তিনি তারযোগে তাঁহার এক আত্মীয়াকে আমাদিগের এস্থানে আগমনের দিন ও জাহাজের নাম লিখিয়া পাঠান তদনুসারে সেই মহিলা আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। আমাদের জলযান পারে ভিড়িবার আগেই তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং নোঙ্গর ফেলিয়া, তরীর গতি রোধ করিবার অব্যবহিত পরেই, ডেকে আসিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্যে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই আমাদিগের কৃষ্ণ লোচনে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবামাত্র, ত্বরিৎগতিতে সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অমলধবল হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। এই নবাগতা নবীনাও ছিলেন না, তেমন নয়নশোভনাও যে তাও বলিতে পারি না, অথচ তাঁহার শিষ্টাচারে এবং মৃদুমধুর ভাষণে আমাদিগের সমগ্র হৃদয় তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। কি সহজ সুন্দর সরলতা! কি অকৃত্রিম উদার ভাব! ইংরেজী ভাষা তাঁহার যতদূর

আয়ত্ত ছিল, তাহাতে চলনসই কথাবার্ত্তায় আট্‌কাইল না। কিছুক্ষণ আলাপের পরই তিনি সাদরে আমাদিগকে সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন আমার আহারের বিশেষ বিধির কথা তাঁহাকে জানাইতে হইল। সেই সুশীলা আমাদিগের এই প্রাচীন প্রথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া, আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে Motor গাড়ী ছিল তিনি আমাদিগকে লইয়া রাজধানী পরিদর্শনে বাহির হইলেন। Copenhagen প্রসিদ্ধ রাজধানী; ইহাতে দেখিবার স্থানের অবধি নাই। বাজার বন্দরের মধ্য দিয়া আমরা চকিতে ধাবিত হইতে লাগিলাম। আমরা এই দুইটী মহিলা এত দূর দেশ হইতে দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়াছি ইহাতে তিনি বড়ই আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং আমাদিগের পরিধেয় পরিচ্ছদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমাদের দেশে যেমন, আগন্তুক অঙ্গনার গায়ের গহনার প্রতি সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি পড়ে, এদেশে কিন্তু ভূষণ অপেক্ষা বসনের প্রতিই সমধিক সমাদর বোঝা গেল।

পরিধেয় পরিচ্ছদের তারতম্য অনুসারেই নাকি এদেশের জনসমাজের ধনসম্পদ অনেক পরিমাণে জ্ঞাতব্য। বেশ বিন্যাস দেখিয়া এতদ্দেশীয় অধিবাসিদিগের জাতি পরিচয় পাওয়া সমাজের পক্ষে একটু দুঃসাধ্য ছিল। কেননা গণ্য মান্য ধনীদিগের আড়ম্বরশূন্য বেশভূষায় সহজেই আমাদিগের মনে ভ্রম জন্মাইবার সম্ভাবনা। তবে বাক্যালাপ এবং ব্যবহারেই লোকের জাতি, কুল, শীল বাহির হইয়া পড়ে ইহা সর্ব্ব-সম্মত। সুতরাং ইঁহাকে সম্ভ্রান্ত-কুলোদ্ভবা বলিয়া জানিতে আমাদের বিলম্ব হইল না। সহরের বিশেষ স্থান সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট পথে আসিয়া Motor থামিতেই আমরা সকলে তথায় অবতরণ করিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করাই এখন আমাদের উদ্দেশ্য। এই প্রকাণ্ড প্রমোদোদ্যানে সম্প্রতি প্রদর্শনী মেলা চলিতেছে। চারিদিগের নৃত্য, গীত, বাদ্যে দিনও মুখরিত। সন্ধ্যায় সর্ব্বত্র আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে, মনে হইল যেন কোন দীপ্তিময় রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। লোকে লোকারণ্য। মানবীয় সর্ব্ববিধ কলানৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা একত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আমরা এক রম্য অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেই পার্শ্বে আমাদিগের বসিবার স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া রাখা হইয়াছে দেখিলাম। আমরা যথাস্থানে উপবেশন করিবা মাত্র আমাদিগের সম্মুখস্থিত টেবিলে সুসজ্জিত খাদ্য দ্রব্যজাত সমেত আমাদিগের প্রতিকৃতি তোলা হইয়া গেল। এ বিষয়ে পূর্ব্বে কোন আভাস না পাওয়াতে, সতর্কতার হস্তে পড়িয়া স্বভাবের সহজ ভাব বিলুপ্ত হইতে পায়

নাই, তাহাতে লাভ কি লোকসান গণিব বলা কঠিন। ততঃপর আহার আরম্ভ। বুঝিলাম এ জাতটা রসনার ভজনা জানে বটে! আমাদেরি জুড়ী! পরিবেশনের প্রণালী দেখিয়া তারিফ না করিয়া পারিলাম না। দেখিলাম খণ্ড বরফ হইতে খুদিয়া বাটী বানাইয়া তন্মধ্যে Straw-berry ফল রাখা হইয়াছে, এবং চিনি দ্বারা কৃত্রিম তুষার প্রস্তুত করিয়া সুস্নিগ্ধ ননীর উপর স্থাপিত করা হইয়াছে। এমন নয়ন রঞ্জন বস্তু নষ্ট করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে কেমন দ্বিধা বোধ হইল। কিন্তু আমাদিগের নিমন্ত্রিকার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে চক্ষুর দোহাই গ্রাহ্য করা গেল না। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল এইরূপ বহুবিধ আহার্য্য বস্তুর সদ্গতি করাইয়া গাত্রোত্থান করিলাম। এবারে অতিথিদিগের অজ্ঞাতসারে, এমনি সুকৌশলে বিল চুকানো ব্যাপার সমাধা হইয়া গেল যে, তৎসম্বন্ধীয় বেতনভোগী ভৃত্যগণের সদাচারে সন্তুষ্ট হইয়া যে তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া যাইব এমন সুযোগও মিলিল না! তাই ভাবিলাম যে সুচতুরা কর্ত্রীদিগের কার্য্যদক্ষতা সর্ব্বত্রই সমান! এবারে এক অভিনয় দর্শন করিতে গেলাম, কিন্তু ভাষার ব্যূহ ভেদ করিতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎকাল নেত্র ও কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনে অতিবাহিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। পথে এক Concert roomএ গিয়া বসিলাম। আমাদিগের নবপরিচিতার অতিথি সৎকারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তিনি যে কখন আমাদিগের জন্য এত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন বোঝা গেল না। এখানকার শ্রুতিমধুর বাদন বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। অন্যূন ষাট সত্তর জন একত্রে মিলিয়া বিভিন্ন যন্ত্র বাজাইতেছিল। এখানে এক অভিনব ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিন চারি শত লোক একই প্রকারের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, দর্শকমণ্ডলীর সহিত বিচ্ছিন্ন ভাবে বসিয়া, একই সময়ে করতালি দ্বারা বাদকদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম ইহারা বেতনভোগী ভৃত্য। দর্শকের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ সময়ে করতালি আবশ্যক হইবে তাহাও পূর্ব্বেই অভ্যাস করান গিয়াছে। ইহাদের বেতনে কোম্পানীর যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহার চতুর্গুণ উপসত্ত রহিয়া যায়; কেননা যে দলের দর্শকের সংখ্যা যত অধিক, তাহার খ্যাতি ততই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সহসা কেহ ইহাদিগকে চিনিতেও পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যদেশের অধিকাংশ স্থলেই নাকি এ প্রথা প্রচলিত আছে। সভ্যতার এবম্বিধ ব্যবসায়িক চাতুর্য্য লক্ষ্য করিয়া আমরা ব্যবসায়-বুদ্ধি-বিরহিতেরা যেন হতভম্ব হইয়া যাই।

এবারে এই উৎসব ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণেচ্ছু হইয়া আমাদের বাষ্পীয় শকটের আশ্রয় লইলাম। কিন্তু আমাদের অভিভাবিকা আমাদিগকে নিজ আবাসে পৌঁছিয়া না দিয়া তাঁহার বসতবাটীতে লইয়া চলিলেন। তাঁহার আদেশমত একটি সপ্ততল গৃহের সম্মুখে আসিয়া আমাদের গাড়ী থামিল। পুনঃ অবতরণ এবং lift এ অধিরোহণ। ইহাতে ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা কাহাকেও ডাকিয়া আনা আবশ্যক হইল না বা দ্বারদেশে কাহাকেও দণ্ডায়মান দেখিলাম না। গৃহকর্ত্রী স্বয়ংই কল টিপিয়া আমাদগিকে উৰ্দ্ধগামী করিয়া লইয়া চলিলেন এবং নিমেষ মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট তলে স্বতঃই আমাদিগের lift স্থগিত হইবামাত্র স্বতঃই তাহার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং আমরা এক অতি পরিপাটী প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপবেশন করিলাম। তখন সেই বিদুষী আমাদিগকে কৌতূহলী দেখিয়া আপনা হইতেই বলিলেন যে আজ বিশ বৎসর যাবৎ তিনি একাকী এই গৃহমধ্যে বাস করেন। এমন কি কোন পরিচারিকাকেও রাত্রিতে এখানে রাখা হয় না। তাহারা দিনের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিয়মিত সময়ে সকলেই চলিয়া যায়। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভদ্রে! তুমি যদি দৈবাৎ রজনীতে পীড়াগ্রস্ত হও তবে কি প্রতিবিধান কর?" মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "চিকিৎসক এবং পরিচারিকাকে ডাকাইবার জন্য আমার শয্যাপার্শ্বে তারযোগে সংবাদ দেবার ব্যবস্থা আছে সুতরাং কাহাকেও প্রহরী রাখা আবশ্যক মনে করি না।" ঘরের আস্‌বাব্‌ দেখিয়া মনে হইল ইনি বেশ অবস্থাপন্ন লোক; অথচ এদেশে কি চুরী ডাকাতির ভয় নাই? কি জানি! তিনি কি কারণে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন কি নিমিত্তই বা একাকী বাস করেন ভদ্রতার অনুরোধে এ সকল কূটপ্রশ্নের মীমাংসা করিতে সাহসে কুলাইল না। এবারকার মত তাঁহার সংসঙ্গ ছাড়িয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সে সৌম্যমূর্ত্তি চিরদিনের তরে ঠাঁই নিল। জাহাজে ফিরিতে রাত্রি হইল। আর একদিন পরেই এ প্রবাসযাত্রার অবসান হইবে ভাবিয়া অন্তরে বড়ই স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম। বিশেষ একমাত্র সন্তান ছাড়িয়া বেশী দিন দূরে থাকা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। মায়ের প্রাণ এবারে অকূলের সন্ধান ছাড়িয়া কূলের দিকে ঝাঁকিয়া পড়িল দেখিয়া, মহাসিন্ধু আপনার তরঙ্গ ভঙ্গে হাসির লহরী তুলিয়া, ক্ষুদ্র জননীকে উপহাস করিতে লাগিল। যদি সে আজ এ ক্ষীণ প্রাণকে তার বক্ষমাঝে লুকাইয়া রাখে, তবে কি সাধ্য আছে জননীর কূলের কিনারা পাইতে? তখন ভীত হইলাম, করযোড়ে বিপুল বারিধির বন্দনায় নিযুক্ত হইলাম।

আর সে বুঝিবা স্তুতিতে পরিতুষ্ট হইয়া শান্ত সমাহিতচিত্তে মাকে বুকে বহিয়া তীরে লইয়া চলিল।

যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই গৃহ পানে মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেও যে পরবাস। অদ্যকার রাত্রি প্রভাতেই কুক্ কোম্পানীর মুরব্বিয়ানা চুকিয়া যাইবে, তাহাতে সেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে কি আমরাই বাঁচিব সে বিচারক উপরওয়ালা। এতদিন এক সঙ্গে বসবাস করিয়া সকলের সঙ্গে যে একটা আত্মীয়তা জন্মিয়া গিয়াছে, আবার বিস্তীর্ণ সংসারে বিচরণ করিতে গিয়া যে তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, সেত জানা কথা! তবু আমাদের ভিজা প্রাণে কেমন সহজেই সবেরি দাগ বসিয়া যায়, তা আবার কালের সব-পোঁছা-হাত নইলে পুঁছিয়া ফেলা শক্ত। কর্ম্মঠ কঠিন প্রাণের কথা অবশ্য আলাদা।

এদিকে সম্প্রীতি-প্রেম-পরাঙ্মুখী প্রবীণারা প্রতীক্ষায় ছিলেন, কত কত নবীন প্রাণ এই সামুদ্রিক যাত্রায়, দুশ্ছেদ্য প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া ধরা পড়ে! আজ তাহা প্রত্যক্ষ কারবার দিন! শুনিলাম সে পাশ কাটিয়া বড় কেহ পলাইতে পারে নাই। আজকার আনন্দ উৎসবের আর অবধি নাই। মনঃকষ্ট শুধু এই মনসিজ বাণে মর্ম্মাহত জনের। এদের আর আখেরী চাওয়ারও বিরাম নাই, বিদায়ের বিধিরও অফুরান নাই। মন মানে ত চোখ ছাড়ে না, আবার চোখ ছাড়েত প্রাণ শোনে না গোছ। অদর্শনের ফলাফলে এরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, করেই বা কি?

এতাবৎকাল সর্ব্ববিধ ক্রীড়া কৌতুকে যাহারা সুদক্ষতার পরিচয় দিলেন তাহাদের মধ্যে অদ্য বহুবিধ পারিতোষিক বিতরিত হইবে। তজ্জন্য সান্ধ্যভোজনের অব্যবহিত পরেই দ্রব্যজাত সুসজ্জিত করা হইল। উহাতে বহু মূল্যের অলঙ্কারাদি হইতে দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী সামান্য জিনিষ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছে। সহসা দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন কোন বিবাহ উপলক্ষে যৌতুক সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এক ষোড়শী কুমারীর উপর বিতরণের ভার অর্পিত হইল। আমার ভ্রাতা তাসখেলোয়াড়দের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যখন এই পরিণত বয়সে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর ন্যায় তাঁহার প্রাপ্য পারিতোষিক গ্রহণ করিতে সেই সুদর্শনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন তখন হাস্য সম্বরণ করে কার সাধ্য? পারিতোষিক বিতরণান্তে বাগ্মীদিগের বাক্যবিন্যাস কিছুক্ষণ চলিল। বলিতে কি? তৎশ্রবণে মনোনিবেশ করিতে গিয়া নিদ্রা দেবীর আরাধনার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু যাত্রা শেষের উৎকণ্ঠিত মনের প্রতি দেবীর কোনরূপ দয়া দেখা গেল না। সুতরাং তন্দ্রাবিরহিত শয়নে নিশিভোর করিয়া কিঞ্চিৎ ক্লান্ত শরীরে গাত্রোত্থান করতঃ উচ্ছৃঙ্খল জিনিষ পত্রের বিহিত বিধান করিতে গিয়া একেবারে ঘর্ম্মাক্ত হওয়া গেল। এ দেশে ত কথায় কথায় হুকুম জারি করিবার জো নাই! এথাকার দাস দাসীগণকে যখন তখন যা কিছু কাজে ডাকিতে পার না। সুতরাং যাতায়াতের বাক্স পেঁটরা, বিছানা পত্তর বান্ধাচান্দির ভার তোমার নিজেকেই নিতে হইবে, এতে তুমি অভ্যস্ত থাক বা নাই থাক। এসব দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে গেলে এদেশ দেখার সখ্ কেমন মান্দা হইয়া আইসে।

তারপর আমার সেই বিশেষ বন্ধুটীর নিকট বিদায় লইতে গিয়া দেখি তিনি নীরবে এককোণে বসিয়া আছেন। আমার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, তীরের জনতার কথা ভাবিতে নাকি আতঙ্কে তার প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে। যদি এমনি ভাবে দিনের পর দিন ভাসিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন তবেই নাকি ছিল ভাল। পুরাতন তাঁকে বড় পীড়া দেয়। আমি অগত্যা কিছুই বলিতে না পারিয়া, নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম তাহা তিনি আদপেই লক্ষ্য করিলেন না। আমার কিন্তু এ বিদায়ে প্রাণে একটু ব্যথা লাগিয়াছিল; সেটা বোধ হয় আমাদের জাতিগত দুর্ব্বলতা।

অরুণালোকে ডেকে আসিয়া দেখি, যাত্রীদিগের মাল সকল, তাহাদের পদবীর অক্ষরের পর্য্যায়ক্রমে সারি সারি রাখা হইয়াছে, Customs houseএর লোক আসিয়া সমুদায় তদারক করিবে বলিয়া, সুগন্ধি, চুরট্, চা ইত্যাদি কতগুলি জিনিষের শুল্ক দিবার নিয়ম। সেজন্য প্রায়শঃই যাত্রীরা অলক্ষিতে সেই সব বস্তু বাক্সজাত করিয়া শুল্কের হাত এড়াইতে চায়, ধরা পড়িলে গুণাগার দিবার বিধি। অনেক সময় বাক্স খুলিয়া দেখাইতে হয়, আবার ভাগ্যক্রমে নাও খুলিতে হয়—সে সব শুল্কগ্রাহীদের খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করে। কাজেই কিস্মতের দোহাই দিয়া লোকে এসব নিষিদ্ধ বস্তু হামেসা বাক্সে পুরিয়া লইয়া চলে। আমাদের সেই বেহারী বন্ধু, Stockholmএর চুরট্ প্রসিদ্ধ বলিয়া তথা হইতে কতকগুলি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং মনের মধ্যে এক মতলব আঁটিলেন যে, যদি ইহাদিগকে Lady's boxএ কোন মতে পুরিতে পারেন তবেই Customs houseকে ফাঁকি দেওয়া চলিবে। Duty তিনি দিবেনই না সাব্যস্ত করিলেন। তখন হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া, আমাকে ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দুইটি চুরটের বাক্স হাতে দিয়া বলিলেন যে গোপনে ইহা আমাদিগের

জিনিষ পত্রের মধ্যে ভরিয়া নিতেই হইবে, মানা তিনি শুনিবেন না। কি করি! অগত্যা এ ছলকার্য্যে সম্মত হইয়া নিজের কাছে কেমন আহম্মক বনিয়া রহিলাম। যদি ধরা পড়ি, তবে আমাদের জাতের উপর একটা দাগ থাকিয়া যাইবে! কি লজ্জার কথা! ইতি চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িলাম। তখন দ্রুত পাদবিক্ষেপে সেই অনভীপ্সিত শ্বেতাঙ্গের আগমন প্রত্যক্ষ করিয়া, আপন আত্মার কাছে অপরাধী বলি "বিপদি মধুসূদন" এই মূল মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। আর কি মধুসূদন ত্রাণ না করিয়া পারেন? অমনি সে ভদ্রমুখ কোনই উচ্চবাচ্য না করিয়া লাল পেন্সিলে "Pass" লিখিয়া তাহাকে সত্য সত্যই বিপদসাগরের পার করিয়া দিলেন। আর তার মুখে হাসি ধরে না। কিন্তু এখনও ভ্রাতুষ্পুত্রীর ভাগ্য পরীক্ষা বাকি ভাবিয়া পুনঃ বিমর্ষ ভাব ধারণ করিল। সে কন্যা বড় চতুরা! যেমনি তাহাকে প্রশ্ন করা হইল যে, কোন রকম সুগন্ধি, চা, চুরট্ সিগারেট্ সে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছে কি না? অমনি সে গ্রীবা উন্নত করিয়া রোষবিস্ফারিত নেত্রে, সেই প্রশ্নকারীর বেয়াদবিতে যেন বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "কি বলিলে? সিগার সিগারেট্?" আর কি না সে কর্ম্মচারী সদাচারিণী বঙ্গনারীকে গর্হিত ধূমপান দোষে জড়িত করিলেন বলিয়া যেন মহা অপ্রতিভের মত আপন কথা ফিরাইয়া নিলেন এবং বিনয় নম্র বচনে "I beg your Pardon Madam" বলিয়া "Pass" লিখিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল। উঃ তখন হাস্ব কত? জানি এ অন্যায্য কর্ম্মের ফলভাগী আমরা নই, আমাদের সেই অবিমৃষ্যকারী বন্ধু। যাক্ সে কথা।

স্থলভূমিতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে, যিনি সকল কর্ণধারের মূল কর্ণধার; যিনি সকল দুস্তর পারাবারের একমাত্র কাণ্ডারী; যাঁহারি ইঙ্গিতে উত্তাল বারিধি বক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে আমরা এই জলযাত্রা সাঙ্গ করিয়া আসিলাম, অবনত মস্তকে তাঁহাকে অন্তরের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। পরে এই জলনিবাসের তাবৎ কর্ম্মচারী দিগের কর্ম্মপরায়ণতার জয় জয়কার করিয়া, বিশেষ ভাবে নাবিক মহোদয়কে ধন্যবাদ দিলাম। এবং এত দিন ধরিয়া কুক কোম্পানীর নুন খাইয়া, তাহার গুণগান করিতেও ভুলিলাম না। সর্ব্বত্র হস্তপ্রসারণ, ধারণ ও বিমর্দ্দন বিধি চলিতে লাগিল। কোথাও বা কপালের বা ললাটের চুম্বনে বিদায়ের ব্যথা চিহ্নিত করা হইল, কিন্তু পদধূলি দানে এবং গ্রহণে যাহাদের বিদায় সূচিত হইয়া থাকে, তারা কি পারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নির্ব্বিশেষে এই পাশ্চাত্য প্রথার অনুসরণ করিতে? বিশেষ বঙ্গমহিলারা ইহাতে বড়ই

বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে! যাহা হউক যেন তেন প্রকারেণ কার্য্য উদ্ধার করিয়া, আপন আপন পথ দেখিলাম। পথে যাইতে যাইতে মনে মনে সংকল্প করিলাম, যতদিন এজীবন ধরি, যেন পুনঃ সংসারের সর্ববিধ সংকীর্ণতার মধ্যে পড়িয়াও এই সকল নয়নাভিরাম দৃশ্য পুঁছিয়া না ফেলি। যেন এই কামচারী মন নিয়ত এ রাজ্যে বিচরণ করিতে আসিয়া, প্রকৃতিদেবীর ভজনায় সেই বিশ্বেশ্বরকে তুষ্ট করিতে পারে। যেন এই হৃদয়ের স্তরে স্তরে অভিজ্ঞতার দিব্যালোক নিপতিত হইয়া দুর্দিনের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দেয়। তবেই দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়া, প্রচুর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া নিত্যধনে ধনী হইয়া সকল দুঃখ দারিদ্র্য বিমোচন করিতে সক্ষম হইব। জানি দানে, এ বিভবের বিলোপ নাই বরং বৃদ্ধি আছে, উপভোগে এ সম্পদে অবসাদ আসে না বরং আনন্দ বাড়ায়! তাই বড় আকিঞ্চন যেন দশে এ ধন দানের শক্তি ধরি আর দিনে দিনে এ নিঃপ্রভ চক্ষুতে দিব্য জ্যোতিঃ লাভ করিয়া, সেই বিচিত্র চিত্রকরের চিত্র-নৈপুণ্য দর্শনে অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাকি।

PUBLIC LIBRARY

সমাপ্ত

Printed by
KARTIK CHANDRA BOSE
for
U RAY & SONS, PRINTERS,
100, Gurpar Road, Calcutta.

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা পরিগ্রহণ সংখ্যা.......................................

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
১৭.১১/৯৭) 2 5 MAR 2003 ৩/০৩			

এই পুস্তকখানি ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা-প্রদত্ত প্রতিনিধির মারফং নির্দ্ধারিত দিনে বা তাহার পূর্ব্বে ফেরৎ হইলে অথবা অন্য পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহার্থে নিঃসৃত হইতে পারে।